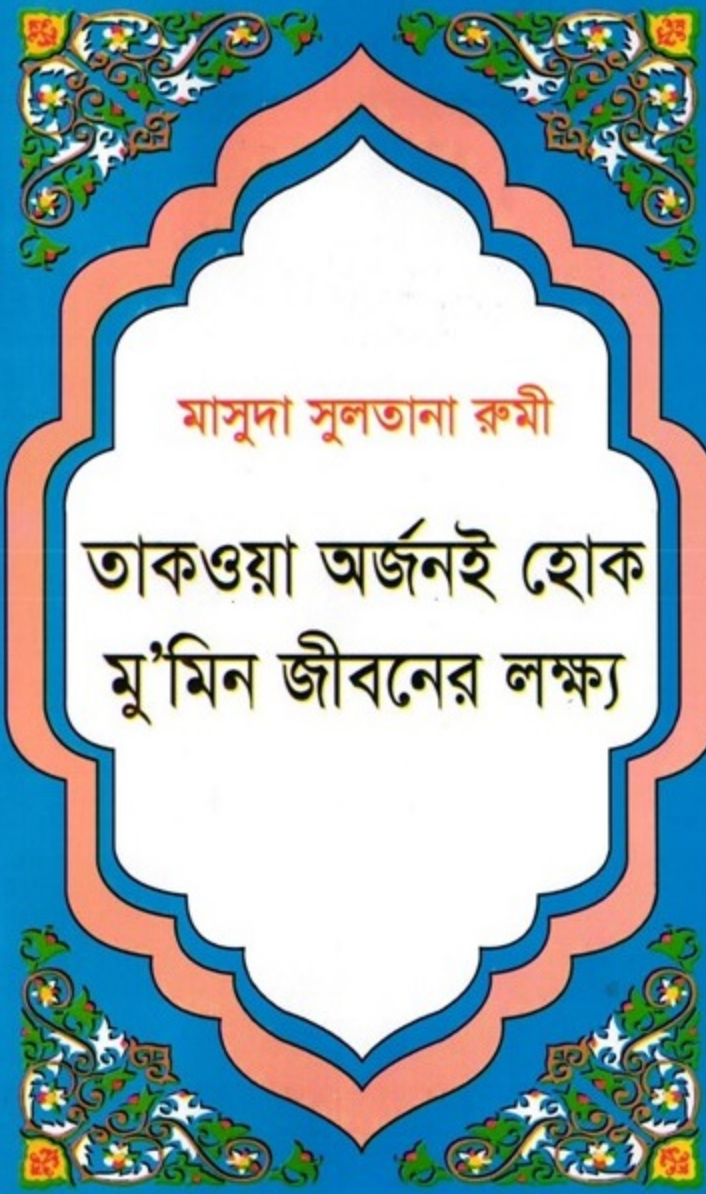

মাসুদা সুলতানা রুমী

তাকওয়া অর্জনই হোক মু'মিন জীবনের লক্ষ্য

তাকওয়া অর্জনই হোক মু'মিন জীবনের লক্ষ্য

মাসুদা সুলতানা রুমী

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স, ঢাকা
৪৩৫/ক, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
মোবাইল: ০১৭১১১২৮৫৮৬, ০১৫৫২৩৫৪৫১৯

www.amarboi.org

তাকওয়া অর্জনই হোক
মু'মিন জীবনের লক্ষ্য
মাসুদা সুলতানা রুমী

প্রকাশক
এ এম আমিনুল ইসলাম
প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
ওয়ারলেস রেলগেইট, মগবাজার, ঢাকা।
ফোন: ০১৭১১ ১২৮৫৮৬, ০১৫৫২ ৩৫৪৫১৯

জমাদিউস সানি: ১৪৩০ হিজরী
জুন: ২০০৯ ইংরেজী

দ্বিতীয় সংস্করণ: ৫ম প্রকাশ:
সেপ্টেম্বর'২০১৪ ইংরেজী

গ্রন্থস্বত্ব: লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

কম্পোজ ও ডিজাইন
প্রফেসর'স কম্পিউটার
মগবাজার, ঢাকা

মুদ্রণ:
ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা

PPBN-056
ISBN-984-31-1426-0

বিনিময় মূল্য: ৩২ টাকা মাত্র।

Takwa Orjhanee hoke Momin jiboner Lakkho by Masuda Sultana rumi and Published by Professor's Publication, Moghbazar, Dhaka-1217. Price: Tk.32.00 only.

www.amarboi.org

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

দ্বিতীয় সংস্করণে লেখকের কথা

আল্‌হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন। ওয়াস সালাতু আলা রাসূলিহিল কারীম ওয়া আলা আলিহী ওয়া আস্‌হাবিহী আযমাঈন। যাবতীয় প্রসংশা এক মাত্র আল্লাহ্‌র পাওনা। নবী মুহাম্মদ (স.), তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সঙ্গী-সাথীদের উপর বর্ষিত হোক অনাবিল শান্তির ধারা।

আমার লেখা আরোও একটি বই প্রকাশ হচ্ছে। "তাকওয়া অর্জনই হোক মু'মিন জীবনের লক্ষ্য" পুস্তিকাখানি মূলত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আমার কয়েকটি প্রবন্ধ। যা প্রকাশক শ্রদ্ধেয় আমিনুল ইসলাম ভাই ছোট্ট একটি মালার মতো গেঁথে সুধী পাঠক মহলকে উপহার দিয়েছেন। ইতিপূর্বে আমার কয়েকটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়ে পাঠক মহলে সাদরে গৃহীত হয়েছে। সেজন্য পাঠকদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। পাঠক মহল অবশ্যই জানেন যে ইতিপূর্বে আমার অবস্থান ছিল বিপরীত মেরুতে। আলোর সন্ধানে আমি দিক-বিদিক ঘুরে বেড়াই উদ্ভ্রান্তের মতো। অবশেষে মহান আল্লাহ্‌ তায়ালা আমাকে হিদায়াত দান করেন। আমি অন্ধকার থেকে আলোর পথে ফিরে আসি, যাকে এক কথায় সিরাতুল মুস্তাকিম তথা সরল পথ বলা যায়। এখানে এসে আমি একদিকে মনের তৃপ্তি খুঁজে পেয়েছি, অপরদিকে পেয়েছি বিরাট কর্মক্ষেত্র। আমার একদিকে চলছে পড়া-শুনা এবং লেখালেখি, অন্যদিকে চলছে মাঠে-ময়দানে কর্ম তৎপরতা। বলতে এবং লিখতে গেলে আগে পড়তে এবং লিখতে হচ্ছে। এই লেখা এবং সমাজ জীবন থেকে বিভ্রান্তি দূর করার জন্যই আমার এ লেখার প্রয়াস। আমি যাতে ক্রমাগত লিখে যেতে পারি সেজন্য আমি শুধু পাঠক মহলের নিকট দোয়া চাচ্ছি।

আমার কোন কথার সংগে পাঠক দ্বিমত পোষণ করলে কুরআন হাদীসের প্রমাণ দিয়ে লিখিত জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করার আশ্বাস দিতে পারি। এ ব্যাপারে পাঠক মহলের সহযোগিতা কামনা করছি। প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স থেকে আরোও তিনটি বই প্রকাশ পেয়েছে। যা পাঠক মহলে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। এটি আমার চতুর্থ বই যা পাঠক মহলে পূর্বের বইগুলোর মতোই সমাদৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস। আল্লাহ্‌ আমাদের সকলের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করুন এ কামনায়।

মাসুদা সুলতানা রুমী
তাং- ০৩.০৫.২০১০ ইং

www.amarboi.org

প্রকাশকের কথা

আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌। সমস্ত প্রসংশা মহান আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য। দুরূদ ও সালাম নবী করিম (সঃ) এবং তার পরিবার পরিজন ও সঙ্গী সাথীদের জন্য। সাম্প্রতিক কালে যে সব লেখক পাঠক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন তাদের মধ্যে নতুন হিসাবে মাসুদা সুলতানা রুমীর নাম পাঠক মহলে অন্যতম।

শুধু তাই নয় তিনি জীবনের সঠিক চলার পথের সন্ধান পেলেন। তারপর তিনি নিবিষ্ট মনে কুরআন মাজীদ, হাদীস শরীফ এবং ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করা শুরু করলেন। এই ব্যাপক অধ্যায়নের ফলে তাঁর নিজের জীবনের পরিবর্তন সূচিত হল। এরপর থেকে পড়া এবং লেখা দুটাই সমান্তরাল ভাবে অব্যাহত আছে।

বলা বাহুল্য অতি অল্প সময়ে পাঠক মহলে বেশ পরিচিতি লাভ করেছেন এবং তার লেখাগুলো বেশ পাঠক প্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। ইতিপূর্বে তার বেশ কয়েকটা পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। আমরাও তার কয়েকটা পুস্তিকা প্রকাশ করেছি। সেই লেখাগুলো ছিল এক একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে। তার বর্তমান পুস্তিকাটি বেশ কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধগুলো ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধের শিরোনামগুলো এখানে উল্লেখ করছি। ১. ঈমান ও আমল ২. তাকওয়া অর্জনই হোক মু'মিন জীবনের লক্ষ্য ৩. যিলহজ্জ মাসের নেয়ামত ৪. কাব্য চর্চা ও ইসলাম ৫. মাহে রমযান কুরআনের মাস ৬. ঈদুল ফিতর ৭. সাওয়াল মাসের নফল রোযা ৮. মুন্সী মুহাম্মদ মেহেরুল্লাহ এবং ৯. নবীর দেশে বাবার কবর। আলোচ্য শিরোনাম গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেকটি বিষয়ে স্বতন্ত্র্য বই লেখা যেতে পারে। বিশেষ করে 'তাকওয়া' বিষয়টা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে রুমী আপা যদি স্বতন্ত্র্য একটা পুস্তিকা রচনা করেন তবে পাঠক বেশি উপকৃত হবে বলে আমরা আশা করি। তেমনিভাবে ঈমান ও আমল এবং কাব্য চর্চা ও ইসলামের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। আশা করি তিনি আমাদের প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করে দেখবেন।

www.amarboi.org

বাজারে বইয়ের অভাব নেই। প্রায় সব সময় নতুন নতুন লেখকের নতুন নতুন বই প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু সব বই পাঠক প্রিয়তা লাভ করে না। এক্ষেত্রে মাসুদা সুলতানা রুমী ব্যতিক্রম। তার লেখাগুলো প্রকাশিত হওয়ার পর পাঠক মহলে রীতিমত ঝড় তুলছে। তিনিও সমান তালে লেখে যাচ্ছেন। আমরা দোয়া করছি আল্লাহ্ তাঁর লেখায় বরকত দিন এবং তার লেখার মাধ্যমে পাঠক মহলের বিভ্রান্তি দূর হোক। নতুন বইয়ের প্রকাশ উপলক্ষ্যে আমরা তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

পরিশেষে মহান রবের নিকট একান্ত আরজ তিনি যেন আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করে উভয় জাহানের কল্যাণদানে বাধিত করেন। আমীন।।

–প্রকাশক

www.amarboi.org

বিষয় সূচি

১.	ঈমান ও আমল.....	৭
২.	তাকওয়া অর্জনই হোক মু'মিন জীবনের লক্ষ্য.....	১০
৩.	যিলহজ্জ মাসের নেয়ামত.....	১৩
৪.	আ কাব্য চর্চা ও ইসলাম.....	২১
৫.	মাহে রমযান কুরআনের মাস.....	২৭
৬.	ঈদুল ফিতর.....	৩০
৭.	সাওয়াল মাসের নফল রোযা	৩২
৮.	মুন্সী মুহাম্মদ মেহেরুল্লাহ.....	৩৫
৯.	নবীর দেশে বাবার কবর.....	৩৮

www.amarboi.org

ইসলামের ভিত্তিই হলো ঈমান বা বিশ্বাস। ঈমান আনতে হবে, অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে- ১. আল্লাহর উপর, ২. ফেরেশতাদের উপর, ৩. নবী রাসূলদের উপর, ৪. কিতাবসমূহের (আল কুরআন এবং পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের উপর অবতীর্ণ কিতাব) উপর, ৫. মৃত্যুর পর বিচার দিবসের উপর, ৬. জান্নাত ও জাহান্নামের উপর, ৭. তাকদীরের ভালো মন্দের উপর। যার এ কয়েকটি বিষয়ের উপর বিশ্বাস বা ঈমান নেই, সে যত ভালো কাজই করুক না, কেন কোনো অবস্থাতেই সে মুসলিম হতে পারবে না।

ঈমানের তিনটি পর্যায়ঃ

১. অন্তরে বিশ্বাস রাখা, ২. মুখে স্বীকার করা, ৩. আর কাজে তা প্রমাণ করা। কাজে প্রমাণের নামই আমলে সালেহ বা নেক আমল। ঈমানের পরই আমলের প্রশ্ন, যার অর্থ কাজ। কাজ তো হবে বিশ্বাসের আলোকে- প্রথম ঈমান তারপর আমল বা কাজ। আবছা অন্ধকারে দড়ি দেখে মানুষ চমকে উঠে। কেউ কেউ সাপ মনে করে চিৎকারও দেয়। সাপে কামড় দিলে মরে যাবে- এ বিশ্বাসের কারণেই দড়ি দেখেও সাপ মনে করে চমকে উঠে চিৎকার দেয়। সাপের উপর যে ধরনের ঈমান, সে ধরনের আমলই সে করে।

লোভ, ভয়, হুমকি-ধমকি যা-ই দেখানো হোক না কেন, একজন সুস্থ মস্তিস্কের মানুষকে কিছুতেই আগুনে হাত দেওয়ানো যাবে না। কারণ আগুনের প্রতি তার ঈমান আছে। আগুনে হাত দিলে তার হাত পুড়ে যাবে– এ বিশ্বাসের কারণেই সে তাতে হাত দেবে না।

আমাদের সমাজের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা আর প্রকৃত অর্থে আমল বলতে যা বোঝায়, তার সাথে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। যেমন অনেকেই বলে, নামায-রোযা ঠিকমতো না করলে কী হবে, ঈমানতো ঠিক আছে– কথাটি যারপরনাই হাস্যকর। কারণ, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, কুরআনে যা লেখা আছে তা আল্লাহ্‌র চিরসত্য বাণী। কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা যা কিছু আদেশ করেছেন, যা কিছু নিষেধ করেছেন, সেগুলো পালন করার নামই তো আমল। নামাযের কথা তো পবিত্র কুরআনে অসংখ্য বার বলা হয়েছে, রোযার কথা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহকারে আলোচনা করা হয়েছে সূরা বাকারায়। এরপর কীভাবে বলা যায়, নামায-রোযা না করলেও আল্লাহর কিতাবের উপর ঈমান ঠিক আছে। কুরআনে আল্লাহ

www.amarboi.org

রাব্বুল আলামীন স্পষ্ট বলেছেন, 'যারা জীবন সমস্যার সব সমাধান আল্লাহ্‌র আইন অনুযায়ী করে না, তারা কাফির।'

এ কিতাবের উপর বিশ্বাস দু'রকম হতে পারেঃ ১. বিধর্মীদের বিশ্বাস মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থের নাম কুরআন শরীফ, বস, হয়ে গেল, এ পর্যন্তই। এর চেয়ে আর বেশি না, কিন্তু একজন মুসলমানের বিশ্বাস হবেঃ ১. এ কিতাব আল্লাহর বাণী, ২. এ কিতাব মহাসত্য, ৩. এর মধ্যে যা আদেশ করা হয়েছে তা পালন করতে হবে, ৪. যা নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং ৫. কোনো অবস্থাতেই এর অন্যথা করা যাবে না।

যারা মনে করে, কুরআন পড়লেই সওয়াব, হরফ প্রতি দশ দশ নেকি, তাদের উদাহরণ নিম্নরূপঃ

মনে করুন, আপনার একজন কাজের বুয়া আছে। আপনি আপনার দৈনন্দিন কাজের তালিকা করে তার হাতে দিয়ে বললেন, তুমি পড়তে পার? সে উত্তর দিল, জ্বি আম্মা পারি। আপনি বললেন, এ তালিকা অনুযায়ী কাজ করবে। আগের কাজ আগে পরের কাজ পরে করবে। কাগজটা তুমি মুখস্থ করে ফেল, তাহলে সুবিধা হবে। বার বার কাগজ দেখতে হবে না। আর কাগজটা মুখস্থ হলে তোমাকে দশ টাকা পুরস্কার দেব। এই বলে আপনি আপনার কর্মস্থলে চলে গেলেন। বিকেলে বাড়ি ফিরে আসতেই কাজের বুয়া দৌড়ে আপনার কাছে এল। হাসিমুখে বলল, খালাম্মা! এটা মুখস্থ হলে দশ টাকা দিতে চেয়েছিলেন। এ দেখুন, আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। আপনি চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলেন, একটা কাজও করেনি। বুয়া কোনো কাজ না করে সারা দিন বসে বসে কাগজ পড়েছে। এবার কি তাকে আপনি পুরস্কার দেবেন, না তিরস্কার করবেন?

কুরআনে পাঁচ রকম আয়াত আছে। হালা, হারাম, মুহকা, মুতাশাবিহ ও আমছাল। তোমরা হালালকে হালাল জেনে গ্রহণ করবে, হারাম বর্জন করবে মুহকামের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করবে, মুতাশাবিহ বিষয়ের উপর ঈমান আনবে আর আমছাল (উদাহরণ) থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে।

মুহকাম হলো সেসব আয়াত, যা স্পষ্ট বোঝা যায়। যার উপর আমল করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ মুহকাম আয়াত স্পষ্ট আদেশ-নিষেধ সম্বলিত। সে আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী কাজ করার নামই হলো আমল করা। মুতাশাবিহ আয়াত অস্পষ্ট, যা ঠিকমতো বুঝে আসে না। তার উপর বিশ্বাস রাখতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ বলতে হবে, এগুলো আল্লাহ্‌ তাআলার তরফ থেকে নাযিল হয়েছে। সূরা

www.amarboi.org

আলে ইমরানে আল্লাহ তাআলা মুহকাম ও মুতাশাবিহ'র পূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং বলেছেন, যারা প্রকৃত বুদ্ধিমান, তারা মুহকাম অনুযায়ী আমল করে।

আর আমছাল আয়াত হলো, যা দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা পুরনো দিনের ঘটনা উল্লেখ করে উদাহরণ পেশ করেছেন। আদম (আ)– এর কথা, নূহ (আ) এবং অন্যান্য নবী-রাসূলদের কথা, বিভিন্ন অবাধ্য জাতির কথা, নমরূদ, ফিরাউন প্রমুখের কথা বলে তাদের জীবনের উদাহরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। এগুলো বিশ্লেষণ করে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য কুরআন পড়তে বলা হয়েছে। এভাবে পড়া, জানা এবং এর আলোকে কাজ করার নামই আমল।

ঈমান আর আমল ওতপ্রোতভাবে জড়িত দুটি শব্দ। একটি বাদ দিয়ে অপরটির কোনো অস্তিত্ব নেই। ঈমান আছে আমল নেই- এ ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। তেমনি আমল আছে কিন্তু ঈমান নেই- এ আমলেরও কোনো মূল্য নেই। আর আল্লাহ্ তাআলা এ কথাটি কুরআন মজীদে অসংখ্যবার বলেছেন। যখনই বলেছেন, 'ইন্নাল্লাযীনা আ-মানূ' এর সাথে সাথেই 'ওয়া আমিলুস্ সা-লিহা-ত'ও বলেছেন।

কোনো ব্যক্তি যদি প্রচুরভাবে কাজ করে শুধু সুনাম অর্জনের জন্য; আল্লাহ্র ভয়, ভালোবাসা কিংবা বিধান পালনের জন্য নয়, তাহলে তার কাজকে নেক আমল বলা যাবে না। এ কাজকে বলা হয়, লোক দেখানো কাজ। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন- ধ্বংস ওই মুসল্লিদের জন্য, যারা লোক দেখানো কাজ করে। (সূরা মাউন)

আর রাসূল (স.) বলেছেন, যারা লোক দেখানো কাজ করল তারা শির্ক করল।

ঈমান ও আমলের এ ত্রুটির কারণ একটিই। তা হলো, আমাদের ইলমের স্বল্পতা। আসুন, মুসলিম আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কুরআন-হাদীসের সঠিক ইলম অর্জন করে ঈমানকে পূর্ণতা দেই, সেই আলোকে আমল করে ভরে তুলি আমলের ভান্ডার, অর্জন করি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি।

θθθ

www.amarboi.org

তাকওয়া শব্দের মূল অর্থ- বেঁচে থাকা, সাবধান থাকা বা সাবধান করা। কুরআন মজীদে এ শব্দটি আল্লাহ্‌কে ভয় করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই ইসলামের পরিভাষায় তাকওয়ার অর্থ আল্লাহ্‌ভীতি। আর যে তাকওয়া অর্জন করে বা তাকওয়া সম্পন্ন হয় তাকে বলে মুত্তাকী বা আল্লাহ্‌ভীরু।

এ তাকওয়া বা আল্লাহ্‌ভীতিই পারে মানুষকে সকল প্রকার খারাবী থেকে দূরে রেখে সকল অন্যায়-অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করে আশরাফুল মাখলুকাতে পরিণত করতে। তাই তো আল্লাহ্ তাআলা কুরআনের পাতায় পাতায় ছত্রে ছত্রে তাকওয়া অনুশীলনের আলোচনা করেছেন।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের স্পষ্ট নির্দেশ, 'তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।' (আল কুরআন : ১৯৭)

সততা, সুবিচার, সহানুভূতি, দয়া-দানশীলতা, উদারতা, আত্মসংযম, দায়িত্ববোধ, ভাষার মিষ্টতা, সত্যবাদিতা- সব কিছুর উৎপত্তিস্থল হচ্ছে তাকওয়া। তাকওয়ার গর্ভেই জন্ম নেয় সর্বপ্রকার কল্যাণ ও মঙ্গলময় বিষয়সমূহ।

হযরত ওমর (রা)- এর এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, সংকীর্ণ রাস্তার দু'পার্শ্বে কাটাওয়ালা গাছ থাকলে পরিধেয় কাপড় সযত্নে গুটিয়ে নিয়ে খুব সাবধানে যেমন পথ চলতে হয়, তেমনি পাপ-পঙ্কিল পৃথিবীতে চলতে গিয়ে অতি সাবধানে আমাদের পা ফেলতে হবে, যাতে পাপ বা আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টিতে জড়িয়ে না পড়ি- এর নামই তাকওয়া।

যারা নিজেদের জীবনে তাকওয়া অর্জন করেছে তারাই মুত্তাকী। কুরআনের শুরুতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহি, হুদাল্লিল মুত্তাকীন।" অর্থাৎ এ কিতাব আল্লাহর কিতাব, এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। এটা পথ প্রদর্শক মুত্তাকীদের জন্য। (সূরা বাকারা : ১)

মুত্তাকীদের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন, "মুত্তাকী তারা, যারা গায়েবে বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে, আমি যে রিয্‌ক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে, যে কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যেসব কিতাব নাযিল করা হয়েছে সে সবের প্রতি বিশ্বাস করে এবং পরকালের প্রতি যাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে।" (সূরা বাকারা : ২ - ৪)

www.amarboi.org

সূরা বাকারার ১৭৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা মুত্তাকীদের সম্পর্কে বলেন, "তোমরা পূর্বদিকে মুখ করলে ও পশ্চিম দিকে মুখ করলে তা কোনো প্রকৃত পুণ্যের কাজ নয়; বরং প্রকৃত পুণ্যের কাজ হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ্কে, পরকাল ও ফেরেশতাদের এবং তোমার রবের অবতীর্ণ কিতাব ও তাঁর নবীগণকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে মান্য করবে, আর আল্লাহ্র ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের প্রিয় ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, পথিকের জন্য, সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাসদের জন্য ব্যয় করবে। এ ব্যতীত নামায কায়েম করবে ও যাকাত দিবে। প্রকৃত পূণ্যবান তারাই, যারা ওয়াদা করলে তা পুর্ণ করে, দারিদ্র্য, সংকীর্ণতা ও বিপদের সময় এবং হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে পরম ধৈর্য অবলম্বন করে। বস্তুত এরাই প্রকৃত সত্যপন্থি, এরাই মুত্তাকী।

এরাই মুত্তাকী এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সকল প্রকার সফলতা এদেরই জন্য। কুরআন মজীদে অসংখ্যবার মুত্তাকীদের জন্য সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। আখিরাতের সকল নিয়ামত আল্লাহ্ তাআলা মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত করেছেন। যেমন কুরআনের ঘোষণা. 'আখিরাতের ঘর তাদের জন্য, যারা প্রাধান্য বিস্তারের জন্য বিপর্যয় সৃষ্টি করেনি। আর উত্তম বিনিময় রয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।' (সূরা কাসাস: ৮৩)

মুত্তাকীদের দলে দলে সসম্মানে জান্নাতের দিকে নেওয়া হবে। (সূরা যুমার : ৭৩)

দুনিয়ার জীবনেও মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। দুনিয়ার জীবনের প্রতিটি সংকটে সংঘাতে, বিপদে-মসিবতে, অভাবে-অভিযোগে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বান্দাদের সাহায্য করার ওয়াদা এবং ধারণাতীত জায়গা থেকে রিয্ক দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের দুনিয়ার যন্ত্রণা থেকে নিস্কৃতি দেবেন, যা তারা ভাবতেও পারে না। (সূরা তালাক: ২ - ৩)

তাকওয়া কোনো বস্তু নয়, কোনো অভ্যাস নয়, কিংবা কোনো গুণের নামও নয়। চর্চা বা অনুশীলনের সাথে নয় তাকওয়ার সম্পর্ক বিশ্বাসের সাথে, ঈমানের সাথে। তারপরও তাকওয়া আপনা-আপনিই কারো মধ্যে সৃষ্টি হয় না। অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টির জন্য সাধনার প্রয়োজন। তাকওয়া অর্জনের জন্য প্রথম প্রয়োজন ইলম- অধিক পরিমাণ কুরআন পড়া, হাদীস পড়া, কুরআন- হাদীস বুঝতে বোঝাতে সহায়ক বইপুস্তক পড়া। এর কোনো বিকল্প নেই। অজ্ঞানতা হলো তাকওয়ার পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। আর জ্ঞানের মূল উৎসই হচ্ছে আল কুরআন। আল্লাহ সম্পর্কে, আখিরাত সম্পর্কে, জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে যারা

www.amarboi.org

জানে আর যারা জানে না, তারা কখনো এক হতে পারে না। জান্নাতগামী লোকেরাই প্রকৃতপক্ষে সফলকাম।" (সূরা হাশর : ২০)

আর জান্নাতগামী তো মুত্তাকীরাই। ইলম অর্জনের পর তাকওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে, 'অর্জিত ইলমের উপর অবিচল বিশ্বাস বা দৃঢ় ঈমান। ঈমানহীন ইলম কখনো মানুষকে মুত্তাকী বানাতে পারে না। তাই তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন মজীদে মুত্তাকীদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমেই গায়েবে বিশ্বাস, শেষে আখিরাতের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসের কথা বলেছেন।

তাকওয়া অর্জনের তৃতীয় মাধ্যম সিয়াম পালন করা। তাকওয়ার সবচেয়ে বড় দুশমন নফসে আম্মারা। সিয়াম নফসে আম্মারাকে কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, "হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদের জন্য সিয়াম ফরয করেছি, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরও ফরয করেছিলাম, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।" (সূরা বাকারা, আয়াত-১৮৩)

যাঁর সামনে পিছনে কোনো গুণাহই ছিল না, যাঁর আনুগত্যের মধ্যেই আল্লাহর ভালোবাসা, যাঁর আনুগত্যের ছায়ায় অবস্থান করাই জান্নাত, সেই রাসূল (স) কী পরিমাণ আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকতেন তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

সাহাবীগণ তাঁর কাছ থেকে সরাসরি শিখেছিলেন কী করে আল্লাহকে ভয় করতে হয়। তাই তো হাজরা মাউত থেকে সানা পর্যন্ত অলংকারে সজ্জিত কোনো সুন্দরী নারী একাকী সফর করলে আল্লাহ্‌কে ছাড়া আর কাউকে ভয় করার প্রয়োজন হতো না। এমন একটি সমাজ গড়ে উঠেছিল শুধু তাকওয়া বা আল্লাহভীতির উপর ভিত্তি করে।

তাকওয়াই পারে মানুষকে দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি দিতে। তাকওয়া অর্জনই হোক আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

θθθ

www.amarboi.org

যিলহজ্জ আরবী বছরের শেষ মাস। বর্ষপরিক্রমায় প্রতি বছরই ঘুরে ঘুরে আমাদের জীবনে আসে নিয়ামত ও ফযীলতে পরিপূর্ণ এ মাস। যিলহজ্জ হজ্জের মাস, যিলহজ্জ কুরবানীর মাস, দ্বিতীয় ঈদের মাস। যিলহজ্জ বরকতময়, ফযীলতময়, নিয়ামতে পরিপূর্ণ একটি মাস। এ মাস মু'মিন জিন্দেগীতে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। এ মাসের প্রথম ৯ দিন নফল রোযার দিন। বিশেষ করে ৯ তারিখ। এ দিবসটিকে বলে আরাফা দিবস। এ দিনটি ক্ষমা ও মুক্তির দিন।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আরাফার দিন আল্লাহ্ তাআলা এত অধিকসংখ্যক লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন, যা আর কোনোদিন দেন না। সেদিন তিনি বান্দার অতি নিকটবর্তী হয়ে যান এবং ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করতে থাকেন। (মুসলিম)

এ দিনের রোযা সম্পর্কে রাসূল (স) বলেন, এ দিনে রোযা রাখলে পিছনের এক বছর এবং সামনের এক বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তবে সেদিন হজ্জ পালনকারীরা রোযা রাখবে না। হাজীগণ বাদে অন্য সবাই রোযা রাখতে পারবে।

এ মাসের ৮, ৯, ১০, ১১ ও ১২ তারিখে হজ্জ সম্পন্ন হয়। সারা বিশ্বের মুসলমানদের অন্তরে এ সময় আল্লাহ্ প্রেমে সাড়া পড়ে যায়। হজ্জের শাব্দিক অর্থ যিয়ারতের সংকল্প বা বাসনা। ইসলামের পরিভাষায়, ইহরামের সাথে হযরত ইবরাহীম (আ)- এর স্মৃতিবিজড়িত মক্কার পবিত্র কা'বাঘর তাওয়াফ, আরাফায় অবস্থান এবং মক্কার নির্দিষ্ট পবিত্র স্থানসমূহে হাজির হয়ে নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী কিছু আনুষ্ঠানিকতা পালন করাই হলো হজ্জ। হজ্জের ফরযিয়াত তথা অপরিহার্যতা অন্যান্য ইবাদাত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআন মজীদে ইরশাদ করেন, আর এ ঘরের হজ্জ করা হলো মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য, যে লোকের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌছার। আর যে লোক তা মানে না, আল্লাহ সারা বিশ্বের কোনো কিছুরই পরওয়া করেন না। (সূরা আলে ইমরান : ৯৭)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌছার জন্য যার পাথেয় ও বাহন আছে সে যদি হজ্জ না করে, তাহলে এ অবস্থায় তার মৃত্যু ইহুদী ও নাসারাদের মৃত্যুর সমান বিবেচিত হবে। অতএব যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করল না, আমরা আদমশুমারী অনুযায়ী তাদের মুসলমান বললেও

www.amarboi.org

প্রকৃত মুসলমান হিসেবে তারা আল্লাহ্‌র দরবারে হাজির হতে পারবে না। হজ্জের সফর হয় সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌কে ভালোবেসে, আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও করুণা পাওয়ার আশায়। এ পবিত্র ইচ্ছা নিয়ে সে যখন হজ্জে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়, তখন তার স্বভাবপ্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। বদলে যায় তার জিন্দেগী, শুরু হয় তার আত্মা ও মগজের পরিশুদ্ধি। হজ্জের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়েই ইমাম আযম হযরত আবূ হানীফা (র) বলেন, হজ্জ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমি বুঝতে পারিনি, ইসলামের ইবাদতসমূহের মধ্যে কোনটি সর্বোত্তম। হজ্জ করার পর হজ্জের কল্যাণ প্রত্যক্ষ করে তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিলেন, হজ্জই সর্বোত্তম।

ক. হযরত রাসূলে কারীম (স) বলেন, মকবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া কিছুই হতে পারে না। (বুখারী ও মুসলিম)

খ. যে ব্যক্তি হজ্জ করার সময় কোনো অশ্লীল ও অন্যায় আচরণ করে নি, সে নিজের গুনাহ থেকে জন্মদিনের মতো পাক-পবিত্র হয়ে গেল। (বুখারী ও মুসলিম, রাবীঃ হযরত আবূ হোরায়রা [রা])

গ. যে ব্যক্তি হজ্জের পথে মারা যায়, তার জন্য একটি কবুল হজ্জের সওয়াব লেখা হয়। (হেদায়া)

ঘ. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মহিলাদের জিহাদ হলো হজ্জ। (মুআত্তা)

এ জন্য হজ্জ ফরয হওয়ার সাথে সাথে হজ্জ আদায় করার জোর তাকিদ দিয়ে রাসূল (স) বলেন, যে ব্যক্তি হজ্জ করার ইচ্ছা করে, সে যেন অতি তাড়াতাড়ি তা সম্পাদন করে নেয়। কারণ, দেরি হলে সে অসুস্থ হয়ে যেতে পারে অথবা তার বাহনও হারিয়ে যেতে পারে কিংবা অন্য যে কোনো সমস্যা হতে পারে। (আহমদ ইবনে মাজাহ)

হযরত আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা একত্রে হজ্জ ও ওমরা কর। কারণ হজ্জ ও ওমরা দারিদ্র্য এবং গুনাহ দূর করে দেয়, যেমন হাপরের আগুনে লোহা ও সোনা রুপার ময়লা দূর হয়। একটি কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়। (তিরমিযী)

হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল (স)- এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (স), কিসে হজ্জ ওয়াজিব হয়? তিনি বললেন, পাথেয় ও বাহন থাকলে। (তিরমিযী)

www.amarboi.org

এখানে ওয়াজিব শব্দটি ফরয অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হজ্জ ফরয- এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ একমত। হজ্জের যাবতীয় খরচ এবং হজ্জ সফরে থাকাকালে পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার বহন করার মতো আর্থিক সামর্থ্য থাকলে এবং বায়তুল্লাহ পর্যন্ত যাতায়াতের ব্যবস্থা থাকলেই কোনো ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হয়।

হযরত আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এক ওমরা অপর ওমরা পর্যন্ত সংঘটিত গুনাহসমূহের কাফফারা স্বরূপ। কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (স)- এর সাথে ছিল। তার উষ্ট্রী তাকে পিঠ থেকে ফেলে দেওয়ায় তার ঘাড় ভেঙে যায়, এতে লোকটি মারা যায়। নবী করীম (স) বললেন, তাকে গোসল দাও, তার দেহে সুগন্ধি লাগাবেনা না এবং তার মূখমন্ডলও ঢাকবে না। কারণ, হাশরের ময়দানে তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

এ অতি ফযীলত ও নিয়ামতপূর্ণ হজ্জ যিলহজ্জ মাসেরই তোহফা।

দ্বিতীয় নিয়ামত কুরবানী

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন, প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমি কুরবানীর একটি নিয়ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, যেন লোকেরা সেই জন্তুর উপর তার রবের নাম স্মরণ করে। (সূরা হজ্জ: ৩৪)

আল্লাহ্ তাআলা আবার বলেন, পশুগুলোর গোশত আল্লাহর নিকট পৌছে না, রক্তও পৌছে না, কিন্তু তোমাদের তাকওয়া তাঁর নিকট অবশ্যই পৌছে। (সূরা হাজ্জ: ৩৭)

কুরবানীর ইতিহাস বহু পুরাতন। হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলের শরী'আতে কুরবানীর নিয়ম ছিল। কুরআন মজীদে আদম (আ)- এর দুই ছেলের কুরবানীর ইতিহাস আমরা পাই। ইরশাদ হয়েছে 'আর তাদেরকে আদমের দুই ছেলের সঠিক কাহিনী শুনিয়ে দাও। তারা দুজন কুরবানী করলে তাদের একজনের কুরবানী কবুল করা হলো, অন্য জনেরটা কবুল হলো না ....। (সূরা মায়িদা : ২৭)

বর্তমানে প্রচলিত যে কুরবানী, তা হযরত ইবরাহীম (আ)- এর সুন্নাত হিসেবে রাসূল (স) পালন করেছেন। আমরাও তা-ই করি।

www.amarboi.org

কুরবানী আরবী শব্দ। আরবী কুরবুন বা কুরবানুন অর্থ নৈকট্য, উৎসর্গ, ত্যাগ ইত্যাদি। আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে তাঁরই দেওয়া বিধান অনুযায়ী ত্যাগ বা উৎসর্গ করার নাম কুরবানী করা। মুসলিম উম্মাহর জন্য যিলহজ্জ মাসের ১০, ১১ ও ১২- এ তিনটি দিন নির্দিষ্ট করা হয়েছে কুরবানীর জন্য। প্রচলিত কুরবানীর সাথে জড়িয়ে আছে হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)- এর আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যের, প্রেমের এবং ত্যাগের সুমহান উজ্জ্বলতম স্মৃতি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পথভ্রষ্ট মানুষকে হেদায়াত করার জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁরা ছিলেন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের কঠিন পরীক্ষা নিয়েছেন। ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ)- এ দুজনই নবী ছিলেন। ইবরাহীম (আ) একদিন আল্লাহ্‌র কাছে চাইলেন, হে প্রভু! আপনি আমাকে নেক সন্তান দান করুন। অতঃপর আমি তাকে সুসংবাদ দিলাম এক অতীব ধৈর্যশীল সন্তানের। (সূরা সাফফাত: ১০০ - ১০১)

ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্‌র কাছে ছেলে চাইলেন। চাইলেন নেক বা সালেহ সন্তান। যাতে সে ছেলে আল্লাহর দীনের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে, সেই সন্তান হলেন ইসমাঈল (আ)। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, অতঃপর ওই সন্তান যখন তার সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করার বয়সে উপনীত হলো, তখন একদিন তিনি বললেন, 'হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি, যেন আমি তোমাকে যবেহ করছি। এখন তুমি চিন্তা-ভাবনা করে দেখ কী করা যায়। তিনি বললেন, হে পিতা! আল্লাহ্ আপনাকে যা করতে হুকুম করেছেন আপনি তা-ই করুন। আল্লাহ্ চান তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল হিসেবে দেখতে পাবেন। অত:পর যখন দুজনই আল্লাহ্‌র আদেশ মানতে রাজি হলেন, তখন পিতা পুত্রকে যবেহ করার জন্য শুইয়ে দিলেন। আমি তাকে ডেকে বললাম, হে ইবরাহীম! তুমি তোমার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ। আমি এভাবেই নেক বান্দাহদের পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই এটা একটা বড় ধরনের পরীক্ষা। (সূরা সাফফাত : ১০৬)

প্রত্যেক নবীকেই কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে, কিন্তু ইবরাহীম (আ)- এর পরীক্ষাগুলো ছিল কঠিনতর। নমরূদের অগ্নিকুন্ডে প্রবেশ করা, দেশান্তরী হওয়া, নবজাত সন্তান ও প্রাণপ্রিয় স্ত্রীকে জনশূন্য প্রান্তরে নির্বাসন দেওয়া, বৃদ্ধ বয়সে সেই সন্তানকে কুরবানী করার জন্য আদিষ্ট হওয়া, এসব কঠিন পরীক্ষায়ই তিনি উত্তীর্ণ হন। যদিও আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে ফেরেশতা জিবরাঈল (আ) ইসমাঈল (আ)- কে সরিয়ে নিয়ে তাঁর পরিবর্তে একটি দুম্বা রেখে দিয়েছিলেন। ইবরাহীম (আ) তো জানতেন না, দুম্বা কুরবানী হচ্ছে। তিনি তো ছেলে কুরবানী

www.amarboi.org

করছেন মনে করেই ছুরি চালিয়েছিলেন। ইবরাহীম (আ)- এর আত্মসমর্পণের এ ঐতিহাসিক ঘটনা স্মরণে রাখার জন্যই আল্লাহ্ তাআলা উম্মতে মুহাম্মাদির উপর কুরবানী ওয়াজিব করেছেন। সূরা কাউসারে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, তোমার রবের জন্য সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, কুরবানীর দিন মানুষ যে কাজ করে তার মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় হচ্ছে রক্ত প্রবাহিত (কুরবানী) করা। কিয়ামতের দিন তা নিজের শিং, পশম ও খুরসহ উপস্থিত হবে। কুরবানীর পশুর রক্ত জমিনে পড়ার পূর্বেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে এক বিশেষ মর্যাদায় পৌছে যায়। অতএব, তোমরা আনন্দিত মনে কুরবানী কর। অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বলেছেন, কুরবানীর প্রতিটি পশমের বিনিময়ে সওয়াব রয়েছে। (তিরমিযী)

লক্ষণীয়, কুরবানীর কী অপরিসীম সওয়াব। তাই সামর্থ্যবান প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্তব্য, আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য নিখুঁত ও উত্তম পশু কুরবানী করা। এটা শুধু রসম বা প্রথা নয়। আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এক বিশেষ ইবাদত। নামায-রোযা প্রভৃতি ইবাদত যেমন আল্লাহ্ ব্যতীত কারো উদ্দেশ্যে হয় না, তেমনি কুরবানীও আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য হতে পারে না। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, তোমার প্রতিপালকের জন্য সালাত কায়েম কর ও কুরবানী কর। তিনি আরো বলেন, হে রাসূল! বলুন, নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সবকিছুই মহান প্রতিপালকের জন্য। (সূরা আন'আম : ১৬২)

আমাদের দেশে কুরবানীর পশু ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রায়ই আভিজাত্যের লড়াই দেখা যায়। এটা অত্যন্ত দূষণীয় এবং গর্হিত অপরাধ। কুরবানীর পশু ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রায়ই প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। যদি এ প্রতিযোগিতা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয় তাহলে তো অত্যন্ত ভালো কথা। আর যদি তা নিজের সুখ্যাতি, মান-সম্মান, বংশমর্যাদা রক্ষার্থে হয় তবে পশু যত দামিই হোক না কে, আল্লাহর নিকট তার কোনো মূল্য নেই। অনেকে আছে, ইসলামের অন্য কোনো বিধি-বিধানের তোয়াক্কা করে না। নামায-রোযারও তেমন পাবন্দ নয়, কিন্তু কুরবানীর ব্যাপারে খুবই সজাগ সচেতন। কোন্টায় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন খুশি হবেন, সে দিকে গুরুত্ব না দিয়ে কোনটায় গোশত বেশি হবে সে দিকে লক্ষ্য। কুরবানীর গোশত তো আল্লাহ্র তরফ থেকে হাদিয়াস্বরূপ আমরা পেয়েছি। মূল উদ্দেশ্য কুরবানী দেওয়া নয়; মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি পাওয়ার আশা। এ সময় আমাদের করণীয় কাজসমূহ হলো:

www.amarboi.org

ক. শুধু আল্লাহ্‌র হুকুম পালনার্থে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পাওয়ার নিয়তে কুরবানী করা।

খ. যে গোশতগুলো পেয়েছি তা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তোহ্‌ফা হিসেবে পেয়েছি মনে করে শুকরিয়া আদায় করা।

গ. যিলহাজ্জ মাসের ৯ তারিখ ফজর থেকে ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত ফরয নামাযের পর তাকবীরে তাশরীক বলা- এটা নারী-পুরুষ সবার জন্য ওয়াজিব।

তাছাড়া চলতে ফিরতে সব সময় তাকবীর বলা উচিত। সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) এ সময় বাজারের অলিতে-গলিতে হাঁটতে-চলতে তাকবীর বলতেন। তাঁর তাকবীর শুনে বাজারের লোকেরাও তাকবীর বলত।

যিলহজ্জ মাসের তৃতীয় নিয়ামত

যিলহজ্জ ঈদের মাস। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসেন, তখন তিনি মদীনায় স্থানীয় দুটি জাতীয় উৎসব দিবস সম্পর্কে অবগত হন। ওই দুই দিবসে মদীনাবাসীরা খেলাধুলা ও আনন্দ ফুর্তি করত। রাসূল (স) ওই দুই দিবস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে মদীনাবাসী বলেন, আমরা জাহেলিয়াতের যুগে এ দুই দিবসে খেলাধুলা করতাম। তখন রাসূল (স) বলেন, আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য ওই দুই দিবস অপেক্ষা আরো উত্তম দুটি দিবস দান করেছেন, সেগুলো হলো: ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। (আহমদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ)

ইসলাম মানব জীবনের প্রতিটি কাজের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। ঈদের দিন আনন্দের দিন, কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। আনন্দের আতিশয্যে যা ইচ্ছা তা-ই করার সুযোগ নেই। মুসলমানের ঈদ তো ইবাদত। ঈদের নামাযের মাধ্যমে এ উৎসবের সূচনা।

ঈদের দিনের করণীয় কাজ

ক. আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে রাসূল (স)- এর নামে দরূদ পেশ করা।

খ. উচ্চঃস্বরে তাকবীর পাঠ করা। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাকবীর উচ্চারণ কর। কেনন, তিনি তোমাদের হেদায়াত দান করেছেন। (সূরা বাকারা)

www.amarboi.org

৯ যিলহজ্জ ফজর নামাযের পর থেকে রাসূল (স) প্রকাশ্যে নিম্নের তাকবীর পাঠ করতেন- আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ।

গ. ঈদের রাতে নফল ইবাদত করা। এ প্রসঙ্গে হযরত ওবাদা ইবনে সামিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দুই রাত সজাগ থাকে, যে দিন সকল অন্তর মরে যাবে, কিন্তু তার অন্তর মরবে না। (তাবারানী)

ঘ. কিছু না খেয়ে ঈদের নামাযে যাওয়া, নামায পড়ে এসে খাওয়া। রাসূল (স) ঈদুল ফিতরের দিন মিষ্টি জাতীয় কিছু খেয়ে নামাযে যেতেন আর ঈদুল আযহার দিন নামায পড়ে এসে কুরবানী সম্পন্ন করে কুরবানীর গোশত দিয়ে প্রথম আহার করতেন।

ঙ. গোলল করা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক ও সুগন্ধি ব্যবহার করা।

চ. সাধ্যানুযায়ী ভালো খাবারের ব্যবস্থা করা।

ছ. ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করা, ছোটদের ঈদের উপহার দেওয়া।

জ. আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা, তাদের খোঁজ-খবর নেওয়া।

ঈদের দিনে বর্জনীয় বিষয়

ক. ঈদ উৎসব পালন করতে গিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা।

খ. আত্মীয়-স্বজনকে ত্যাগ করা, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

গ. পরপুরুষের ভিতর দিয়ে বেপর্দায় নারীদের অবাধ বিচরণ করা।

ঘ. এমন সাজসজ্জা করা, যাতে পরপুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

বিভিন্ন জাতির ধর্মীয় উৎসবে নীতি-নৈতিকতা এমনকি পবিত্রতার নাম-গন্ধও থাকে না। সেখানে অর্থের অপচয়, অশ্লীলতা, নারী-পুরুষের বেপর্দায় অবাধ মেলামেশা হয় এবং চরিত্রহীনতার এক ঘৃণ্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়। দামি কাপড়-চোপড়ের-প্রদর্শনী চলে। গরিবেরা সেখানে কোণঠাসা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের ঈদ হচ্ছে খুশি ও পবিত্র অনুভূতির প্রকাশ এবং গরিব মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের উৎকৃষ্ট সুযোগ। ঈদে ধনী-গরিব নির্বিশেষে এক কাতারে দাঁড়িয়ে সবাই আল্লাহকে সিজদা করে। সকলে এক আল্লাহর বান্দা

www.amarboi.org

হিসেবে সমপর্যায়ের হয়ে যায়। মুসলমানের ঈদ তো ইবাদত। গোটা মুসলিম জাহান ওই দিন জান্নাতী আনন্দে দুলে উঠে।

এই যে আল্লাহর তরফ থেকে তিনটি তোহফা, তিনটি নিয়ামত, তিনটি ফযীলত ... হজ্জ, কুরবানী আর ঈদ; তাতো এ যিলহজ্জ মাসেই। প্রতি বছর যিলহজ্জ মাস এ তিনটি তোহফা নিয়ে আমাদের কাছে আসে, আমাদের আমলনামারূপী সঞ্চয়পত্র পরিপূর্ণ করতে। আমাদেরও সচেষ্ট থাকতে হবে সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য। কুরবানীর ঈদ ত্যাগের ঈদ। হজ্জ কবুল হওয়ার, কুরবানী কবুল হওয়ার আনন্দ।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, অনেকের হজ্জই কবুল হয় না শুধু নিয়তের ত্রুটির কারণে। তেমনি অনেকের কুরবানীতে নিয়তের ত্রুটি থাকে। যেমন- লোকদেখানো, গোশত খাওয়া ইত্যাদি। সুতরাং আমরা যেন হৃদয় থেকে নিষ্ঠার সাথে বলতে পারি:

নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ শুধু আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য।

θθθ

www.amarboi.org

ইসলাম আজো অজ্ঞতার নিগড়ে বন্দী, আজো অস্পষ্টতার বেড়াজালে আবদ্ধ, আজো তেলেসমাতির গোলক ধাঁধায় আবৃত, আজো সন্দেহের নেকাবে ঢেকে আছে ইসলামের সত্য-সুন্দর স্বাভাবিক অপরূপ ছবি।

যদিও ধীরে ধীরে অজ্ঞানতা, অস্পষ্টতা ও সন্দেহের গোলক ধাঁধা অপসারিত হচ্ছে, কিন্তু তা অতি ধীরে। জানি না এ গতি অব্যাহত থাকলে কত যুগ কত কাল লেগে যাবে ইসলামকে তার সঠিক অবস্থানে পৌছাতে।

এ উপমহাদেশে ইংরেজদের আগ্রাসনের পর থেকেই মুসলমানদের এই দুর্দশা। এই তো কিছু দিন আগেও মুসলমানরা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ধর্মের মতো ইসলামকেও মনে করত একটি অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্ম। যার কিছু অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন করলেই ধার্মিক নামে পরিচিত হওয়া যায়, আত্মপ্রসাদও পাওয়া যায়।

আজ কিন্তু অনেকেই স্বীকার করছেন, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান। এ স্বীকৃতির পেছনে আছে জ্ঞান চর্চা। কুরআন-হাদীসের বাংলা অনুবাদ, প্রাজ্ঞ মনীষীদের রচিত ইসলামী সাহিত্যভান্ডার অধ্যয়নেই অজ্ঞানতার কালো পর্দা সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। তাই ইসলামকে জানার জন্য, মানার জন্য জ্ঞানার্জন করা খুবই জরুরি। এর কোনো বিকল্প নেই। কুরআন নাযিল করেছেন আল্লাহ্ তাআলা 'পড়' নির্দেশের মাধ্যমে। 'পড়, তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা আলাক : ১)

জ্ঞানার্জনের জন্যই প্রয়োজন অক্ষর জ্ঞানের। আর এ কারণেই রাসূল (স) বলেছেন, একটি অক্ষর পড়লে দশটি নেকী পাবে। বদর যুদ্ধে বন্দীদের মধ্য থেকে যারা মুক্তিপণ দিতে পারে নি তাদের মুক্তিপণ হিসেবে ধার্য করা হয়েছিল, দশ জন নিরক্ষরকে অক্ষর দান করা।

আজ আমরা অনেকেই অক্ষরজ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়েছি। তারপরও ইসলামের স্পষ্ট ধারণা আমাদের নেই। ইসলামী বলে যা জানি তা আসলেই ইসলামী কি না তা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ, ইসলাম সম্পর্কে যা জেনেছি তা তো লোকমুখে শুনে। আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশিত- পড়, তোমার প্রভুর নামে- এ আমলের মধ্য দিয়ে নয়। তাই জানার মধ্যে রয়ে গেছে মস্ত বড় ফাঁক এবং ফাঁকিও। এ কারণেই ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান স্বীকার করার পরও এ পরিপূর্ণতার স্বরূপ কী, তা আমাদের মুসলিম সমাজের সবার কাছে স্পষ্ট নয়।

www.amarboi.org

কিছু দিন আগেও মাইকে আযান দেওয়া হারাম বলা হতো। মেয়েদের বিদ্যা শিক্ষা অর্জন হারাম মনে করা হতো। এমনকি মেয়েদের নাম শোনাও নাজায়েয মনে করা হতো। আমাদের আলেমদের মধ্যে অনেকে মনে করতেন, ইসলামের নামে রাজনীতি করা হারাম। এখন আলেমরা তা মনে করেন না, কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশেরই ধারণা, ইসলাম আর রাজনীতি এক সাথে চলতে পারে না।

এক সময় ইসলামী অর্থনীতির কোনো ধারণাই আমাদের ছিল না, কিন্তু এখন আমরা কল্যাণমুখী অর্থনীতি বলতে ইসলামী অর্থনীতিই বুঝি। এ বুঝটা সর্বসাধারণের কাছে পৌছে দিতে না পারলে অজ্ঞতার পর্দা সমাজ থেকে কী করে অপসারিত হবে? ইসলামের সৌন্দর্য ও ব্যাপকতার সাথে মানুষ কী করে পরিচিত হবে?

'ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান'- এ সত্য সমাজে আজো অস্পষ্ট ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। একজন পরিপূর্ণ মানুষ নিজেকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক আরো যত প্রকার কর্মকান্ডে জড়িত করে বা জড়িত থাকে, তার প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর ইসলাম তাকে দিকনির্দেশনা দেয়।

একজন পরিপূর্ণ মানুষের কর্মকান্ডের হাজার দিকের মধ্যে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। অথচ ইসলামে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা এখনো দূর হয় নি, কিংবা অন্যভাবে বলা যায়, সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা সম্পর্কে ইসলামের দিকনির্দেশনা কী তা এখনো আমাদের সঠিকভাবে জানা হয়নি। এ কারণেই শিল্পী-সাহিত্যিকগণ তাদের সঠিক মূল্য পাচ্ছেন না। তারা হচ্ছেন অনাকাঙ্খিত অবহেলার শিকার।

সাহিত্য-সংস্কৃতি একটি জাতিকে সমৃদ্ধ করে, সুসভ্য করে, সচেতন করে, ইতিহাস-ঐতিহ্য চেতনায় আলোকিত করে, আত্মপ্রত্যয়ী করে ও সংবেদনশীল করে।

রাসূল (স) প্রাক-ইসলাম যুগের ইমরুল কায়সের অশ্লীল সাহিত্যকেও ধ্বংস করেন নি। বলেছেন, জাতির সম্পদ।

আমাদের মতানুযায়ী ইসলামকে শুধু উপস্থাপন করলেই চলবে না; বরং ইসলামের বিধান অনুযায়ী আমাদের চলতে হবে। একটি কথা আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে, রাসূল (স) যেভাবে যে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন, সেভাবে সে কাজ করার নামই ইবাদত। তাঁর পছন্দের বাইরে কোনো কাজ ভালো হতে পারে না। তিনি যা ভালো বলবেন তা-ই ভালো, তিনি যা খারাপ বলবেন সেটাই খারাপ- এটাই ঈমানের দাবি।

www.amarboi.org

সাহিত্যিকদের ব্যাপারে বিশেষ করে কবিদের ব্যাপারে আমাদের সাধারণ মুসলমান, আল্লাহ্ওয়ালা এমনকি আলেমগণও যথেষ্ট আগ্রহী নন; বরং এ ব্যাপারে তাঁরা একেবারেই নির্বিকার। ঠিক এ কারণেই সর্বস্তরের মানুষের কাছে ইসলামকে উপস্থাপন করা যাচ্ছে না।

অথচ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (স) কবি-সাহিত্যিকদের খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। সমাজে কত ধরণের মানুষ আছে। চিকিৎসক, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, উকিল আরো কত কি, তাদের কারো নামেই আল্লাহ্ তাআলা কোনো পূর্ণাঙ্গ সূরা নাযিল করেন নি, কিন্তু কবিদের নামে কুরআন মজীদে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা নাযিল করেছেন। সূরা শু'আরা।

সূরা আসরে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যেমন বলেছেন, 'সমস্ত মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। শুধু ওইসব লোক ছাড়া, যারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছে, ভালো কাজ করেছে, হকের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়েছে।'

সকল ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মধ্য থেকে উপরিউক্ত চারটি গুণসম্পন্ন মানুষকে আল্লাহ্ তাআলা তুলে এনেছেন তাঁর রহমতের ছায়ায়। ঠিক তেমনি সূরা শু'আরায় আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'তুমি কি দেখ না, তারা (কবিরা) উপত্যকায় উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো এবং এমনসব কথা বলে, যা তারা করে না। তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে ও ভালো কাজ করে এবং আল্লাহ্কে বেশি বেশি স্মরণ করে। আর তাদের প্রতি যুলুম করা হলে শুধু প্রতিশোধ নেয়। আর যুলমকারীরা শিগ্‌গিরই জানবে তাদের পরিণাম কী।' (সূরা শু'আরা : ২২৫-২২৭)

প্রথমে সাধারণভাবে কবিদের যে নিন্দাবাদ করা হয়েছে, তা যে কত বড় সত্য তা বলার অপেক্ষ রাখে না। আরবের কাব্যাঙ্গনে সে সময় যেসব বিষয়বস্তুর সমাবেশ ঘটেছিল, তা ছিল অবৈধ প্রেমচর্চা, শরাবপান, গোত্রীয় ঘৃণা-বিদ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, বংশীয় ও বর্ণগত অহংকার। কল্যাণ ও সুকৃতীর কথার স্থান সেখানে অতি অল্পই ছিল। এ ছাড়া মিথ্যা, অতিরঞ্জন, অপবাদ, নিন্দাবাদ, অযথা প্রশংসা, আত্মগর্ব, তিরস্কার, দোষারোপ, মুশরিকী, অশ্লীল পৌরাণিকতা এ কাব্যধারার শিরায় শিরায় প্রবাহিত ছিল। এ কাব্য সাহিত্য সম্পর্কে রাসূল (স)-এর রায় ছিলো, তোমাদের কারো পেট পুঁজ ভরে থাকা কবিতায় ভরে থাকার চেয়ে ভালো। এ পথভ্রান্ত কবিদের মধ্য থেকে এমনসব কবিদের এখানে আলাদা করা হয়েছে, যাদের মধ্যে রয়েছে চারটি বৈশিষ্ট্যঃ

www.amarboi.org

ক. যারা ঈমানদার অর্থাৎ আল্লাহ, তাঁর রাসূল, তাঁর কিতাবসমূহ মানেন এবং আখিরাতের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস রাখেন।

খ. যারা আমলে সালেহ বা ভালো কাজ করেন। ঈমানের আলোকে কুরআনের নির্দেশিত কাজগুলোর নাম আমলে সালেহ। নিজেদের কর্মজীবনে যারা সৎ, নৈতিকতার বাধনমুক্ত হয়ে যারা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেন না।

গ. আল্লাহ্‌কে যারা বেশি বেশি করে স্মরণ করে। অর্থাৎ তাদের চিন্তা-ভাবনায়, কর্মকান্ডে, রচনায়ও আল্লাহর স্মরণ থাকে। তাদের ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহভীতি এবং রাসূলের আনুগত্য আছে; কিন্তু কবিতা যেন পাপ-পঙ্কিলতা, লালসা ও কামনারসে পরিপূর্ণ না হয়। কিংবা এমনও যেন না হয়। কবিতায় বড় তত্ত্বকথা পরিলক্ষিত হচ্ছে, কিন্তু ব্যক্তিজীবনে আল্লাহর স্মরণের কোনো চিহ্ন নেই। যে কথা আল্লাহ তাআলা সূরা সফ্-এ বলেছেন, 'লিমা তাকূলূনা মা-লা-তাফ'আলূন।' অর্থাৎ, তোমরা এমন কোনো কথা বল না, যা কার্যত কর না।

তিনিই আল্লাহ্ তাআলার একজন পছন্দনীয় কবি, যার ব্যক্তিগত জীবন যেমন আল্লাহর স্মরণে পরিপূর্ণ, তেমনি নিজের সমগ্র কাব্যপ্রতিভা এমন পথে পরিচালিত, যা ফাসিক লোকদের পথ নয়, যারা আল্লাহ্‌কে চায়, আল্লাহ্‌কে ভালোবাসে ও আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে তাদের পথ।

ঘ. যারা ব্যক্তিগত স্বার্থে কারোর নিন্দা বা দোষ বর্ণনা করে না, কিন্তু যখন যালিমদের মোকাবিলায় সত্যের প্রতি সমর্থনের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন তার কণ্ঠকে ঐ কাজে ব্যবহার করে, যে কাজে একজন মুজাহিদ তার তীর ও তরবারি ব্যবহার করে।

কাফির ও মুশরিক কবির ইসলাম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যেসব অপবাদের তান্ডব সৃষ্টি করত, তার জবাব দেওয়ার জন্য নবী করীম (স) নিজে ইসলামী কবিদের উদ্বুদ্ধ করতেন, সাহস জোগাতেন। রাসূল (স) বলতেন, 'মুমিন ব্যক্তি তলোয়ার দিয়ে লড়াই করে এবং কণ্ঠ দিয়েও।'

বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাসূল (স) সাহাবায়ে কেরামকে কবিতা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন। একবার রাসূল (স) আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে বললেন, আবদুল্লাহ, কবিতা কী তা আমাকে বল। আবদুল্লাহ উত্তর দিলেন, কবিতা সেই জিনিস, যা আমার অন্তরে উদিত হয় এবং আমার জিহ্বা তা বলে দেয়। রাসূল (স) বললেন,

www.amarboi.org

তাহলে আমাকে কিছু কবিতা আবৃত্তি করে শোনাও। অতঃপর তিনি আবৃত্তি করে শোনালেন, যার মধ্যে এ চরণ দুটিও ছিলঃ

'আমি আল্লাহর জন্য, আপনাকে তিনি যে সুন্দর ব্যবস্থা দিয়েছেন তা গ্রহণ করেছি।'

রাসূল (স) কবিদের জন্য দু'আ করতেন এবং সুসংবাদ দিতেন। কবি হাসসানকে তিনি দুবার জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তাদের প্রশংসা ও সম্মান করতেন। উত্তম ও সুন্দর কবিতা শুনে আনন্দ পেতেন।

কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূল (স) যেমন মনোভাব পোষণ করতেন, সাহাবায়ে কেরামও ঠিক তদ্রূপ মনোভাব পোষণ করতেন। তারাও ভালো কবিতাকে ভালোবাসতেন এবং মন্দ কবিতাকে ঘৃণা করতেন।

হযরত আবূ বকরের (রা) প্রচুর কবিতা মুখস্থ ছিল। তিনি কবিতা শুনেই বলতে পারতেন এটা কোন্ কবির কবিতা। অন্যান্য বিষয়ের মতো তাঁর কবিতা সম্পর্কেও জ্ঞান ছিল অপরিসীম।

হযরত ওমর (রা) কবিতার প্রতি খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তিনি বলেন, কবিতা আরবদের কথামালার একটি বিনোদনমূলক বিষয়। এর দ্বারা রাগ প্রশমিত হয়, পেরেশানী ও উদ্বেগ দূর হয়। কোনো জাতি এর দ্বারা বিশ্ব সভায় তাদের আসন করে নিতে পারে এবং প্রার্থীকে এর দ্বারা কিছু দেওয়া যায়।

মানুষের উত্তম শিল্প ও সৃষ্টি হলো কবিতা, যা সে প্রয়োজনের মুহূর্তে ব্যবহার করতে পারে। যা দ্বারা সে মহান ব্যক্তির কৃপা লাভ করতে এবং দুর্বৃত্তের হৃদয় আকৃষ্ট করতে পারে। (ইবনে আবদ রাব্বিহী, আল ইকদুল ফারীদ, ৩য় খন্ড, পৃ. ৩৯০)

তিনি আরো বলেন, কবিতা হলো কোনো জাতির এমন এক জ্ঞানভান্ডার, যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোনো জ্ঞান নেই। হযরত আলী নিজেই খুব উচ্চস্তরের কবি ছিলেন। কবিতা সম্পর্কে তার বক্তব্য কত যে সুন্দর! তিনি বলেনঃ

কবিতা হলো একটি জাতির সভ্যতার মাপকাঠি। হযরত আলী (রা) শুধু কবিই ছিলেন না; অন্য কবিদেরও তিনি খুবই সম্মান করতেন, তাদের শ্রদ্ধা করতেন। কবিতার মূল্যায়ন করতেন। একবার এক বেদুইন তাঁর কাছে কিছু সাহায্য চাইলে তিনি তাকে একটি চাদর দান করেন। তখন তাকে বেদুইন খুব সুন্দর একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনায়। তখন তিনি তাকে পঞ্চাশ দিনার উপহার দেন।

www.amarboi.org

প্রকৃতপক্ষে রাসূল (স) এসেছিলেন আল্লাহ্ তাআলার ভাষায়, সকল জীবনব্যবস্থার উপর ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য। ইকামতে দীনের মিশনকে সামনে রেখেই তাঁর গোটা জীবন আবর্তিত হয়েছে। তাই যেসব কথা ও কাজ দ্বারা তাঁর মিশনের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে, সেসব কথা ও কাজকে তিনি অনুমোদন দিয়েছেন। ঢালাওভাবে তিনি কবিতা পছন্দও করেন নি; অপছন্দও করেন নি। যেসব কবিতায় দীনের দাওয়াত, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা, আনুগত্য, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ভালোবাসা, আল্লাহ্র গোটা সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে, তা তিনি পছন্দ করেছেন, শুনেছেন, প্রশংসা করেছেন, কবিদের উৎসাহ দিয়েছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের পুরস্কৃতও করেছেন।

খুবই আফসোস লাগে, যেখানে রাসূল (স) এবং তাঁর সাহাবীগণ কবিতার এত সমঝদার ছিলেন, স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কবিদের নামে একটি সূরা নাযিল করেছেন, কবির কবিতা কেমন হবে তার দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, সেখানে আমরা বর্তমান মুসলমানরা কী করছি?

আর তাই তো আধুনিক শিক্ষিতদের ধারণা, আলেমরা কবিতার কী বুঝে, কিংবা সাহিত্যের কী বুঝে?

তাদের ধারণা, ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিতদের মানবিক বিকাশ নেই, যেহেতু তারা সাহিত্য বুঝে না। বর্তমান প্রেক্ষপটে কথাটি বহুলাংশে সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিল্প-কবিতা এসব জীবনেরই একটি অংশ। অতএব এ দিকটি বাদ দিয়ে জীবনবিধান পূর্ণ হতে পারে না। অথচ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান।

রাসূল (স) এবং সাহাবীদের জীবনে পাই যার স্পষ্ট পদচারণা, সেই কবিতাকে আমরা কী করে অবমূল্যায়ন করি?

আমাদের কি উচিত নয় কবিদের সম্মান করা, সহযোগিতা করা, উৎসাহ দেওয়া?

θθθ

www.amarboi.org

ঋতু পরিক্রমায় বারোটি মাসে- এক বছর। এ বারো মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে মাস তার নাম রমযান। 'রাময' ধাতু থেকে রমযান শব্দের উৎপত্তি। যার অর্থ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে সোনাকে খাঁটি করে, রমযানও তেমনি ক্ষুধা-পিপাসা দিয়ে সমস্ত আরাম থেকে মাহরূম করে বান্দাকে তার সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পরিচ্ছন্ন করে খাঁটি করে।

এ মাসের শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য, ফযীলত, মর্যাদা যে সকল মাসের তুলনায় অনেক অনেক উর্ধ্বে, সে বিষয়ে কোনো মুসলিমের কোনো প্রকার দ্বিমত নেই, কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেন এই শ্রেষ্ঠত্ব? এ মাসের একটি নফল ইবাদত অন্য মাসের একটি ফরয ইবাদতের সমতুল্য। এ মাসের একটি ফরয অন্য মাসের সত্তরটি ফরযের সমতুল্য।

এ মাসে একজন রোযাদারকে ইফতার করালে অন্য মাসে সত্তর জনকে ইফতার করানোর সমতুল্য সওয়াব হয়।

এ মাসে প্রথম দশ দিন রহমতের, দ্বিতীয় দশ দিন বরকতের, তৃতীয় দশ দিন নাজাতের। এ মাসে জান্নাতের সবগুলো দরজা খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা হয়।

এ মাস সিয়াম সাধনার মাস। এ মাস তওবা কবুলের মাস। এ মাস নিষ্পাপ হওয়ার মাস, এ মাস পুণ্যের মাস। এ মাস দয়ার মাস, করুণার মাস, দানের মাস, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের মাস। সম্মানের মাস। কদরের মাস। হাজার মাসের চেয়েও সম্মানিত যে রাত সেই রাতের মাস ...। আরো যে কত ফযীলত, কত মর্তবা এ মাসের, তা লিখে প্রকাশের সাধ্য এ ক্ষুদ্র লেখিকার নেই।

কিন্তু কেন এত সম্মান এত মর্যাদা? এ মাসে রোযা ফরয করা হয়েছে এ জন্যই কি এ মাসের এত মর্তবা? না, মূলত তা নয়। যে কারণে এত মর্তবা সে কারণ হলো আল কুরআন। এ মাসে পবিত্র কুরআন মজীদ নাযিল হয়েছে। এ মাস কুরআনের মাস। তাই এ মাসের এত মর্যাদা।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ঘোষণা, 'রমযান মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে। এতে রয়েছে মানুষের জন্য হেদায়াত এবং পথ প্রদর্শন ও সত্য-মিথ্যার সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ। (সূরা বাকারা : ১৮৫)

'আমি এ কুরআন কদরের রাতে নাযিল করেছি।' (সূরা কদর : ১)

কদরের রাত রমযান মাসে অবস্থিত। প্রতি রমযানে রাসূল (স)- কে জিবরাঈল (আ) একবার কুরআন শোনাতেন। যে বছর রাসূল (স) ইন্তিকাল করবেন, সে বছর রমযানে জিবরাঈল (আ) দু'বার তাঁকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনান।

www.amarboi.org

কুরআনের কারণেই এ মাসের মর্যাদা এত বেশি। এখন কথা হলো, যার জন্য এ মাসের এত সম্মান, এত ফযীলত, তাকে যদি না চিনি, তাকে যদি সম্মান না করি, তার আদেশ-নিষেধ যদি না মানি, তার মর্তবা যদি না বুঝি, তাহলে কি রমযান থেকে লাভবান হওয়া যাবে?

সহীহ হাদীসে জিবরাঈল (আ) বলেন, 'যে ব্যক্তি রমযানের রোযা পেল, কিন্তু নিজেকে নিষ্পাপ করতে পারল না, তার উপর আল্লাহর লা'নত। রাসূল বললেন, আমীন।

কত বড় সাংঘাতিক কথা! জিবরাঈল (আ) প্রস্তাব পেশ করলেন, আর রাসূল (স) আমীন বলে তা পাস করিয়ে নিলেন। অর্থাৎ রমযানের রোযা পেয়ে তা পালনের পরও যদি কেউ নিষ্পাপ হতে না পারে, তার ওপর আল্লাহর লা'নত, আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হতে থাকবে। নিজেকে আল্লাহর লা'নত থেকে রক্ষা করতে হলে, নিষ্পাপ করতে হলে, রোযা কবুল করাতে হলে শর্ত একটাই- কুরআনকে মানতে হবে।

মনে করুন, আপনার মেয়ের বরযাত্রী এসেছে। বরযাত্রীকে আমরা খুবই সম্মান করি। তারা কোনো জিনিসপত্র নষ্ট করে ফেললে আমরা হাসিমুখে সহ্য করি। বরযাত্রীর খাওয়া শেষ না হলে আমরা খাই না। যদি এমন হয়, বরযাত্রী এসেছে; কিন্তু সাথে বর আসেনি, বর আসবে না- এ বরযাত্রীকে কি কেউ খেতে দেবে? কারণ বরযাত্রীর সম্মান বরের কারণে। তেমনি রমযানের সম্মান কুরআনের কারণে। যদি কুরআনকেই মান্য করা না হয়, তাহলে রমযানের গুরুত্ব থাকল কোথায়? জানি, প্রায় সবাই বলবেন, কুরআনকে তো আমরা সম্মান করি। ওযূ করে ভক্তির সাথে তিলাওয়াত করি। প্রতি রমযানে খতম করি, কিন্তু তিলাওয়াত আর খতম করলেই তো সম্মান করা হয় না।

একজন স্ত্রী তার স্বামীকে খুবই সম্মান করে। দেখা হলেই আদবের সাথে সালাম করে, কিন্তু আদেশও মানে না, নিষেধও শুনে না। উপদেশেরও মূল্য দেয় না। এতে কি সম্মান হলো? স্বামীকে সম্মান করার মানে প্রত্যেকটা আদেশ-নিষেধ-উপদেশ মনোযোগসহকারে শুনে নিষ্ঠার সাথে মানা। এমনকি তার পছন্দের কাজগুলো করাও, যাতে স্বামী তার ওপর সন্তুষ্ট থাকে।

আদেশ-নিষেধ না মেনে শুধু সালাম করার নাম যেমন সম্মান করা নয়; বরং তামাশা করা, তেমনি কুরআন তিলাওয়াত করে চুমু খেয়ে তুলে রাখার নাম সম্মান করা নয়; কুরআনকে সম্মান করা হবে তখনই, যখন রাসূল (স)- এর নির্দেশমতো কুরআন পড়া হবে। রাসূল (স) বলেছেন, 'কুরআনে পাঁচ রকম আয়াত আছে- হালাল-হারাম, মুহকাম-মুতাশাবিহ, আমছাল। তোমরা হারামকে হারাম জেনে বর্জন করবে। হালালকে হালাল জেনে গ্রহণ করবে। মুহকাম

www.amarboi.org

অনুযায়ী আমল করবে। মুতাশাবিহ আয়াতের ওপর ঈমান আনবে, আর আমছাল থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে।

মুহকাম হলো ওইসব আয়াত, যা স্পষ্ট আদেশ-নিষেধ সম্বলিত। মুতাশাবিহ ওইসব আয়াত, যা অস্পষ্ট, রূপক, সেটার ওপর ঈমান আনতে হবে। আর আমছাল ঐসব আয়াত, পূর্বকারের ঘটনা উল্লেখ করে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা সূরা আলে ইমরানে বলেছেন, 'এ কুরআনে দুই রকম আয়াত আছে- এক মুহকামাত, যা কুরআনের মূল বুনিয়াদ, দ্বিতীয় মুতাশাবিহ।'

পৃথিবীতে এমন কোনো পুস্তক পাওয়া যাবে না, যে পুস্তকখানা মানুষ পড়ে, কিন্তু বুঝে না। আমরা যদি একটা ফালতু উপন্যাসও পড়ি তা হলেও তার ঘটনা বুঝি। গল্প পড়ে কখনো হাসি কখনো কাঁদি। কারণ, বইটা আমরা বুঝি। অথচ বড়ই আফসোস ও পরিতাপের বিষয়, কুরআন আমরা সারা বছর পড়ি। রমযানে একাধিক বার খতম করি। অথচ কী পড়ি কিছুই বুঝি না। না বুঝলে মানার তো প্রশ্নই আসে না। আর না মানলে কী করে সম্মান করা হলো কুরআনকে, আর কুরআনকে অমান্য করে রমযানের তোহফা কি মিলবে নসীবে?

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই রাসূল (স)- কে একা পেলে অপমান করার চেষ্টা করত। আবার লোক সম্মুখে খুবই তাযীমের সাথে কথা বলত। আমাদের অবস্থা কি তেমনি হয়ে যাচ্ছে না?

সর্বশেষে পেশ করছি বুখারী শরীফের সেই বিখ্যাত হাদীসটি। আমার উম্মতের মধ্যে এমন একদল লোক হবে, যারা সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করবে; কিন্তু কুরআন তাদের গলার নিচে নামবে না (অন্তরে প্রবেশ করবে না)। তারা আমার দীন থেকে বেরিয়ে গেছে যেমন তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায় ....।

এ হাদীস পড়লেই ভয়ে আমার গা শিউরে উঠে। এরা কারা? এরা কি আমরা নই? যারা প্রত্যহ সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করি, অথচ কিছুই বুঝি না, তা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে না। জান্নাতের আয়াত পুরস্কারের আয়াত পাঠ করলে আশায় বুকও বাঁধি না। জাহান্নামের আয়াত, ভয়ের আয়াত পাঠ করলে ভীতও হই না।

মুসলিম জনগণের প্রতি আমার আহ্বান, আসুন, আমরা কুরআন বুঝি, কুরআনকে মান্য করি, এর বিনিময়ে লাভ করি আসন্ন রমযানের ফযীলত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সেই তাওফীক দান করুন, আমীন।

θθθ

www.amarboi.org

মুসলমানদের বৃহৎ আনন্দ উৎসব দুটি। একটি ঈদুল ফিতর, অন্যটি ঈদুল আযহা।

আরবী ভাষা বিশেষজ্ঞরা ঈদ শব্দের অর্থ বলেছেন ফিরে আসা। বছরে একবার এ উৎসব দিবসটি খুশি ও কল্যাণের সওগাত নিয়ে ফিরে আসে। তাই এটিকে ঈদ বলে।

ফিতর মানে ভাঙা। ইফতার শব্দ এ ফিতর থেকেই উদগত। ঈদুল ফিতর মানে রোযা ভাঙার ঈদ।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসেন, তখন তিনি মদীনার স্থানীয় দুটি জাতীয় উৎসব দিবস সম্পর্কে অবগত হন। ওই দুই দিবসে মদীনাবাসীরা খেলাধুলা ও আনন্দ-ফূর্তি করত। রাসূল (স) ওই দিবস দুটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। মদীনাবাসীরা বলেন, সেই জাহেলী আমল থেকে আমাদের মধ্যে এ দুটি দিন পালনের ধারা চলে আসছে। আমরা এ দুই দিন খেলাধুলা ও আনন্দ তামাশা করে কাটাই। তখন রাসূল (স) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের জন্য ওই দুই দিবস অপেক্ষ দুটি উত্তম দিবস দান করেছেন। সেগুলো হলো, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। (আহমদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ)

সেই থেকে ঈদের সূচনা। ঈদুল ফিতর রোযা ভাঙার আনন্দ। আর ঈদুল আযহা যবেহ করার আনন্দ। বস্তুত রমযানের সিয়াম সাধনার মাধ্যমে বান্দা রহমত, মাগফিরাত ও মুক্তির সুসংবাদের আনন্দ লাভ করে। এ এক আনন্দঘন মুহূর্ত। ফজরের নামাযের কিছুক্ষণ পরেই হালকা কিছু মিষ্টি খেয়ে ঈদের ময়দানে ছুটে চলে মুসল্লিরা। ছোট-বড়, যুবক-বৃদ্ধ, ধনী-গরীব, বাদশা-ফকীর সকলেই এক কাতারে নামায আদায় করে। নামাযশেষে একে অপরের সাথে কোলাকুলির আকাঙ্খাই সেই ঈদের আনন্দের পূর্ণতা দান করে।

আসলে আল্লাহ্ তাআলা বান্দার সিয়াম সাধনার পুরস্কারের আনন্দের সামান্য নমুনা দেখান ঈদুল ফিতরের দিন। মু'মিনের আসল আনন্দ তো হবে জান্নাতে।

ঈদুল ফিতর সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। যখন ঈদুল ফিতর রাতের আগমন হয়, ওই রাতকে পুরস্কারের রাত হিসেবে অভিহিত করা হয়। যখন ঈদের সকাল নামে, তখন মহান আল্লাহ্ তাআলা প্রতিটি প্রান্তরে ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তারা অবতরণ করে পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারা ডাকতে থাকেন। তাদের আহ্বান মানুষ ও জিন ছাড়া সব মাখলুক শুনতে পায়। তারা বলেন, ওহে উম্মতে মুহাম্মাদী! বের হয়ে এস অতি মর্যাদাবান প্রতিপালকের কাছে। তিনি অধিক পরিমাণ দান করেন এবং মারাত্মক অপরাধও ক্ষমা করেন। যখন লোকজন বেরিয়ে এসে ঈদগাহে সমবেত হন তখন আল্লাহ্

www.amarboi.org

ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করেন, শ্রমিক যখন তার নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করে তখন তার বিনিময় কী হতে পারে? ফেরেশতাকুল আরয করেন, হে আমাদের প্রভু! হে আমাদের আল্লাহ্ তার বিনিময় তো পুরোপুরি দেওয়া উচিত। তখন আল্লাহ ঘোষণা করেন, 'হে আমার ফেরেশতাসকল, আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, যারা রমযান মাসের রোযা রেখেছে, আমি তাদের সিয়াম সাধনা ও তাদের রাতের ইবাদতের বিনিময়ে তাদের আমার সন্তুষ্টি ও ক্ষমা দান করলাম। তারপর আল্লাহ তাআলা বান্দাদের উদ্দেশ্যে আরো বলেন, ওহে আমার বান্দারা, তোমরা আমার নিকট চেয়ে নাও। আমি আমার সম্ভ্রমের কসম খেয়ে বলছি, তোমরা তোমাদের এ ঈদ সমাবেশে পরকালের জন্য যা কিছু চাইবে, তা আমি দেব। আর দুনিয়ার ব্যাপারে যা চাইবে, আমি সে ব্যাপারে বিবেচনা করব।

আমি আমার সম্ভ্রমের কসম খেয়ে বলছি, যত দিন তোমরা আমাকে সমীহ করে চলবে, তত দিন আমি তোমাদের ভুল-ত্রুটি চেপে যাব। আমার ইজ্জতের কসম, আমি তোমাদের কাফির ও অপরাধীদের সামনে অপমানিত লাঞ্ছিত করব না। অতএব তোমাদের ক্ষমা করা হলো। তোমরা ঘরে ফিরে যেতে পার। তোমরা আমাকে রাজি করেছ। আমি তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছি। তখন ফেরেশতারা উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর আল্লাহর অবদান ও করুণা দেখে পুলকিত হবেন। তারা একে অপরকে সুসংবাদ জানাবেন। (বায়হাকী)

তাই ঈদের আনন্দ হবে ক্ষমা পাওয়ার আনন্দ, রোযা কবুলের আনন্দ নিষ্পাপ হওয়ার আনন্দ, জাহান্নাম থেকে নাজাতের আনন্দ।

অপ্রিয় হলেও সত্য, আজ আমরা ঈদের আসল উদ্দেশ্য বিচ্যুত হয়ে বিজাতীয় ভাবধারায় তা উদ্‌যাপন করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। ঈদের বর্তমান রূপ বড় বেদনাদায়ক। একটা দিনও যারা রোযা রাখেনি, দেখা যায় তারাই ঈদের আনন্দে মেতে ওঠে বেশি। অথচ রাসূল (স) বলেছেন, যারা রোযা পালন করেনি, তারা যেন আমার ঈদের মাঠে না আসে। অর্থাৎ, যারা রোযা পালন করল না ঈদের আনন্দে শরীক হওয়ার কোনো অধিকার তাদের নেই। আবার দেখা যায়, ঈদের আনন্দ করতে গিয়ে সারা দিন নামাযেরও খবর থাকে না। অনেককে দেখা যায়, তারা ঈদের রাতে পটকা ফুটানো, সারা রাত অশ্লীল সিনেমা দেখে হৈ হুলো করে কাটায়। আরো অনেক অনৈসলামিক কাজ দিয়ে ঈদের আনন্দ উপভোগ করে। অথচ ঈদের দিন যেমন ইবাদতের দিন, তেমনি ঈদের রাতও ইবাদত কবুল হওয়ার রাত।

তাই আসুন, আজ থেকে সকল গোমরাহী, নাফরমানী ও বিদআত কাজ থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ অনুযায়ী ঈদ উদ্‌যাপন করার শপথ নিই। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের তাঁর বিধান মেনে চলার তাওফীক দান করুন।। আমীন।

www.amarboi.org

আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় সাধিত যে কোনো কাজ আপাতদৃষ্টিতে যত ক্ষুদ্রই মনে হোক না কেন, আল্লাহ্ তাআলার কাছে তা মোটেও ক্ষুদ্র নয়। তিনি বান্দার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন ফেরেশতাদের। রমযানের রোযা ফরয রোযা- পালনীয় রোযা। ইচ্ছা করে ছেড়ে দিলে কবীরা গুনাহ, আর অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যাবে। এ রোযা বিনা কারণে ছাড়লে কঠিন গুনাহ এবং কঠিন শাস্তির ঘোষণা দেওয়া আছে। এ রোযার সাথে জড়িয়ে আছে মহান প্রভুর অসন্তুষ্টির ভয়, শাস্তির ভয়, ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়ার ভয়।

আর শাওয়াল মাসের রোযা তো নফল- মানে ঐচ্ছিক রোযা। আল্লাহ্ তাআলার ভয়ে নয়; ভালোবেসে রোযা, প্রেমের রোযা, মহব্বতের রোযা, অতিরিক্ত করুণা পাওয়ার আশায় রোযা।

মনে করুন, আপনার দুজন কাজের লোক আছে। প্রথম জন আপনার তরফ থেকে নির্ধারিত সব কাজই করে অবসর সময়ে ঘুমায়। না হয় কোথাও বেড়াতে যায়। আরেক জন আছে, সেও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে এবং অবসর সময়ে আপনার খিদমতে নিয়োজিত থাকতে চায়। আপনি প্রথম জনকে বেতন দেবেন। কারণ, সে তার প্রতি নির্ধারিত দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পাদন করেছে, কিন্তু দ্বিতীয় জনকে বেতনের পরেও অতিরিক্ত কিছু দিতে ইচ্ছা করবে। কেননা, সে আপনার খিদমত করেছে। সে যদি দায়িত্বের অতিরিক্ত আপনার খিদমত না করত তাহলে আপনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হতেন না, কিন্তু কাজটা করার কারণে আপনি তার প্রতি অতিরিক্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন। নফল ইবাদতগুলোও তেমনি। না করলে গুনাহ নেই, কিন্তু করলে আল্লাহ্ তাআলা খুশি হন। যাতে প্রমাণ হয়, আপনি আল্লাহ্ তাআলাকে শুধু ভয়ই পান না; ভালোও বাসেন।

হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রমযানের সিয়াম পালনের পর শাওয়াল মাসের ছয় দিন সিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর সিয়াম পালন করল।

হাদীসে বলা হয়েছে, প্রতিটি নেক কাজ দশ গুণ বৃদ্ধি পায়। সে হিসেবে রমযানের ত্রিশ রোযাকে দশ গুণ করলে তিনশ' দিনের রোযা হয়। তার সাথে শাওয়াল মাসের ছয় দিনের দশ গুণ ষাট দিন। এতে তিনশ' ষাট দিন রোযা রাখার সমতুল্য হয়ে গেল।

www.amarboi.org

উল্লিখিত হাদীসের আলোকে শাওয়ালের ছয় রোযা তো রমযানের সমমর্যাদা পেয়ে যায়। হযরত আশরাফ আলী থানভী (র) বলেন, প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখার মতো শাওয়ালের রোযা মুস্তাহাব। কোনো কোনো হাদীসে এ রোযা রমযানের পর পরই রাখার কথা উল্লেখ রয়েছে।

আমাদের দেশে এক দল মুসলমান আছে, যারা শাওয়াল মাসের ছয় রোযাকে বলে সাক্ষী রোযা। এ ছয় রোযা নাকি সাক্ষ্য দেবে, আমি রমযানের ত্রিশ রোযা করেছি। তাদের অভিমত হচ্ছে, ছয় রোযা না করলে রমযানের রোযার কোনো মূল্যই নেই। এতে তো রমযানের রোযার চেয়েও এর দাম বেশি হয়ে গেল। এরকম কথা ঠিক নয়। আরেক দল আছে নফল রোযাকে তারা মোটেও গুরুত্ব দেয় না। তাদের ভাষ্য, ফরযই ঠিকমতো হয় না আবার নফল। এই ছয় রোযাকে তারা একেবারেই অপ্রয়োজনীয় মনে করে।

এ দুই শ্রেণীর লোকই ভ্রান্তির প্রান্তসীমায় বাস করছে। নফল ইবাদতকে ফরযের মতো গুরুত্ব দেওয়া যাবে না। সেই কাজের লোকের উদাহরণটা আবার পেশ করছি। লোকটি যদি তার ওপর দেওয়া নির্ধারিত কাজগুলো না করে মনিবের অতিরিক্ত খিদমত করতে আসে তাহলে মনিব কি তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে? মনিব তো তখন উল্টো রাগান্বিতই হবেন।

ফরয বাদ দিয়ে নফলেরও ঐ পরিণতি। আল্লাহ্‌কে খুশি করতে হলে ফরয ইবাদতগুলো বান্দাহর প্রতি ন্যস্ত নির্ধারিত অবশ্য পালনীয় দায়িত্বগুলো আগে সম্পাদন করতে হবে। এই অবশ্য পালনীয় দায়িত্বের মধ্যে শুধু নামায-রোযাই নয়; আরো অনেক দায়িত্ব আছে। যেমন-

ক. পর্দা করা ফরয,

খ. বাবা-মায়ের সাথে ভালো ব্যবহার করা ফরয,

গ. প্রতিবেশীর হকের প্রতি খেয়াল রাখা ফরয,

ঘ. ইসলামী আন্দোলন করা ফরয,

ঙ. ইল্‌ম অর্জন করা ফরয।

এমনি আরো অনেক ফরয আছে, যা কুরআন মাজীদে বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতএব ফরয বাদ দিয়ে নয়; ফরযের যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে তার সাথে নফল ইবাদতগুলো করতে হবে। আবার যারা নফল ইবাদতকে মোটেই

www.amarboi.org

গুরুত্ব দেয় না তারাও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিচ্ছে না। আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভ করতে হলে ফরযের পাশাপাশি অবশ্যই নফল কাজ করতে হবে।

৩০ দিন ফরয রোযার পর প্রথম নফল রোযাই হলো শাওয়ালের ছয় রোযা। আর যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা রোযা রাখাকে খুবই পছন্দ করেন। রোযাদার বান্দাকে নিয়ে আল্লাহ্ তাআলা ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করতে থাকেন, দেখ আমার বান্দাহ তার খানাপিনার সব ব্যবস্থা আছে, শুধু আমার রহমত পাওয়ার আশায় আমার করুণা পাওয়ার আশায় সে নিজেকে খানাপিনা থেকে বিরত রেখেছে।

সারা বছরই নফল রোযা রাখা যায়। তার মধ্যে শাওয়ালের এই ছয় রোযা বিশেষ গুরুত্ব রাখে। একমাস রোযা রাখার পর বান্দাহ যখন ক্লান্ত-শ্রান্ত তখনো আল্লাহকে খুশি করার সামান্যতম সুযোগও বান্দাহ ছাড়ে না- এই ছয় রোযার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়।

আল্লাহর রেজামন্দি হাসিলের জন্য শাওয়াল মাসের ছয় রোযার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই আসুন আমরা রমযানের রোযার পরপরই শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রেখে পূর্ণ এক বছর রোযা রাখার সওয়াব অর্জন করি।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন, যে ক্ষুদ্রতম ভালো কাজ করবে তাও সে দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল) আল্লাহ্ তাআলা আমাদের ছোট-বড় সর্বপ্রকার ভালো কাজ করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

θθθ

www.amarboi.org

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ এক অবিস্মরণীয় নাম। এ কালজয়ী মহাপুরুষ (১৮৬১ সালের ২৬ ডিসেম্বর) বাংলা ১২৬৮ সালের ১০ পৌষ যশোর জেলার কালিগঞ্জ থানার বারোবাজারের নিকট ঘোপ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে ছাতিয়ানতলায় তাঁর পৈতৃক বাড়ি। তাঁর পিতা মুন্সী মোহাম্মদ ওয়ায়ের উদ্দিন একজন ধার্মিক মুসলমান ছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি পিতাকে হারান। আর্থিক অনটনের কারণে শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হয়। তাঁর নিজের ভাষায়, 'আমি আমার মায়ের যত্ন ও চেষ্টাতে যাহা কিছু শিখিয়াছি।' তিনি ১৪ বছর বয়সে কয়ালখালি গ্রামের মৌলবী মেসবাহ উদ্দীনের কাছে তিন বছর লেখাপড়া করেন। মো: ইসমাঈল সাহেবের কাছে তিন বছর যাবত আরবী, উর্দু এবং ফারসি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর জ্ঞানপিপাসা ছিল প্রবল।

দারিদ্র্যের চাপে তিনি যশোর জেলা কোর্টের কেরানির পদে চাকরি শুরু করেন, কিন্তু মেহেরুল্লাহ ছিলেন স্বাধীনচেতা মানুষ। কিছু দিন পরেই তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে যশোর দড়াটানায় একটা দর্জির দোকান খুলে বসেন। এ দর্জির দোকান তৎকালীন বিভিন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মিলনকেন্দ্র হয়ে উঠে। তৎকালীন মুসলিম সমাজের অবস্থা ছিল শোচনীয়। ভাগ্য বিড়ম্বিত মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি সকল দিক দিয়েই সমৃদ্ধি লাভ করা থেকে বঞ্চিত ছিল। আর রাজ্যহারা মুসলমান সমাজ ইংরেজ সরকার এবং হিন্দু জমিদারদের অত্যাচার উৎপীড়নে চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। খ্রিস্টান পাদ্রিরা এ সুযোগে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য গ্রামে-গঞ্জে-শহরে-বাজারে গিয়ে ইসলাম সম্পর্কে কুৎসা রটনা করে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে থাকে। পবিত্র কুরআনের অপব্যাখ্যা, মহানবী (স) সম্পর্কে কটুক্তি করা এবং ইসলামকে জনসাধারণের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করতে থাকে। ধর্মপ্রাণ মুন্সী মেহেরুল্লাহ এতে যারপরনাই ব্যথিত এবং ক্ষুব্ধ হন। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি বিভিন্ন জায়গায় সভা-সমিতিতে গিয়ে এর বিরোধিতা করতে লাগলেন। এখান থেকেই শুরু হলো তাঁর বিপ্লবী জীবন।

পাদ্রিদের অপপ্রচার এবং প্রলোভনে পড়ে হিন্দুদের সাথে অনেক মুসলমানও খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করছিল। মুসলমান সমাজের সামনে ঘোর অন্ধকার। তাদের শৌর্য-বীর্য রাজ্য সব যাওয়ার পর অবশিষ্ট ছিল শুধু ধর্ম, তাও যাওয়ার পথে। হতাশাগ্রস্ত মুসলমানদের সামনে আলোকবর্তিকাস্বরূপ আবির্ভূত হন মুন্সী

www.amarboi.org

মেহেরুল্লাহ। তিনি বাংলা ও আসামের হাটে, মাঠে, জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে খ্রিস্টানদের অপপ্রচার ব্যর্থ করে দেন। এ মিশন নিয়ে তিনি দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত নিরলসভাবে ছুটাছুটি করতে থাকেন। এ সময় তার এক ঘনিষ্ঠ সহচর মুন্সী জমির উদ্দিন খ্রিস্টানদের যুক্তিতর্কের কাছে পরাজিত হয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে তা প্রচারে মনোনিবেশ করে এবং জন জমির উদ্দিন নাম ধারণ করে। তিনি এলাহাবাদ সেন্ট পলস ডিভাইনিটি কলেজে খ্রিস্টধর্ম প্রচার বা মিশনারি বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং পাঠকরত্ন উপাধি পান। ১৮৯২ সালে জন জমির উদ্দিন খ্রিস্টীয় বান্ধব পত্রিকায় 'আসল কুরআন কোথায়' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন, আসল কুরআনের অস্তিত্ব কোথাও নেই। তখন মুন্সী মেহেরুল্লাহ 'সুধাকর' পত্রিকায় 'আসল কুরআন সর্বত্র' নামে দীর্ঘ প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে এক বছর পর্যন্ত প্রকাশ করতে থাকেন। মুন্সী মেহেরুল্লাহর ক্ষুরধার লেখনী ও অকাট্য যুক্তিতে জন জমির উদ্দিনের ভুল ভাঙে। তিনি তওবা করে নতুন করে কালেমা পড়ে মুন্সী জমির উদ্দিন হয়ে যান। মেহেরুল্লাহ'র সাথে একত্রিত হয়ে পূর্ণ উদ্যমে ইসলামের খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ আসাম ও বাংলার গ্রামে-গঞ্জে শহরে-বন্দরে বিভিন্ন জায়গায় সভা-সমাবেশ করে বিভিন্ন মানুষের সাথে মিশে একটা বিষয় গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, অশিক্ষাই সমস্ত কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের মূল। এ জন্য তাঁর প্রত্যেকটি বক্তৃতায় তিনি শিক্ষার প্রতি খুবই জোর দিতেন। কুরআন-হাদীস না বোঝা না জানার কারণে বাংলার মুসলমান হিন্দুদের অনুকরণ করত। খ্রিস্টান পাদ্রিরা সহজে তাদের ওপর প্রভাব ফেলতে পারত। কারণ, নিজেদের সম্পদ সম্পর্কে তাদের যে বলতে গেলে কোনো জ্ঞানই ছিল না।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতি, সদাপ্রফুল্ল ও কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি প্রখর ছিল।

এক সভায় এক পাদ্রি শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স)- কে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য (যেহেতু মুসলমানের নবী) এবং খ্রিস্টানদের ঈশ্বরপুত্র যীশুকে বড় করার জন্য বলল, 'আমাদের নবী দেখ কত বড়, তিনি আসমানে উঠে গেলেন। আর মুসলমানদের নবী মাটির নিচে শুয়ে থাকলেন।' ভরা মজলিস মুন্সী সাহেব শ্রোতাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'পাদ্রি সাহেব যা বললেন তা সত্য, তাদের নবী আসমানে উঠে গেছেন, আর আমাদের নবী মাটির নিচে শুয়ে আছেন। আপনারা জানেন, যা হালকা তা উপরে উঠে যায় আর যা ভারি তা নিচেই থাকে। আর সবচেয়ে বড় কথা ও আসল কথা হলো, ওনাদের নবী সবাইকে

www.amarboi.org

ছেড়ে একা একা জান্নাতে গিয়ে বসে আছেন। আর আমাদের নবী আমাদের এত ভালোবাসেন যে, তিনি এ মাটির পৃথিবীতেই শুয়ে আছেন। উম্মতদের নিয়ে জান্নাতে যাবেন: একা একা যাবেন না। এখন আপনারাই বলুন, কে বড় আর কে ছোট?

এ ধরনের অনেক কাহিনী ও ঘটনা আছে, যা মুন্সী মেহেরুল্লাহ'র উপস্থিত বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয় বহন করে।

আঠারো শতকে ইসলামের ওপর খ্রিস্টানদের আক্রমণ ছিল ভয়াবহ টর্নেডোর মতো, উত্তাল জলোচ্ছাসের মতে, যা মুসলমানদের ঈমান আকীদা ভেঙে তছনছ করে দেয়, ভাসিয়ে নিয়ে যায় সকল শিক্ষা-দীক্ষা, রীতিনীতি। মুন্সী মেহেরুল্লাহ এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি 'আমরু বিল মা'রূফি ওয়া নাহী আনিল মুনকার'- এর দায়িত্ব নিয়ে সেই সর্বগ্রাসী সয়লাবের সামনে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়ান, কিন্তু আফসোস, আমাদের বর্তমান প্রজন্ম তাঁর নামই জানে না। মুন্সী মেহেরুল্লাহ'র কাজের স্বীকৃতি দেওয়া আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন, আমীন।

১৩১৪ বঙ্গাব্দে ২৪ জৈষ্ঠ্য ১৯০৭ সালে ৮৬ বৎসর বয়সে কর্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লাহ ইন্তিকাল করেন।

θθθ

www.amarboi.org

২০০১ সাল। আব্বা-আম্মা হজ্জে যাবেন। সবাই খুশি। তাদের জন্য কিছু কেনাকাটা করা দরকার। তাই একটু ব্যস্ত। আব্বা জানালেন, প্রায় দেড়মাস থাকতে হবে আরবে। মনটা একটু খারাপ হলো। এতদিন আব্বা-আম্মাকে না দেখে কী করে থাকব? শ্বশুর বাড়ি যাই ১৫/২০ দিন হলেই অস্থির। ছোট বোনটা বলেই ফেলল, অতদিন কী করে থাকব? আব্বা হাসিমুখে বললেন, আমি মারা গেলে কী করে থাকবা?

আব্বা নিজেও খুব ব্যস্ত। আমাদের সংসারের বাজার-সওদা আব্বাই করতেন। তাই কোনো দোকানে কিছু পাওনা বাকি আছে কি না প্রতিটি দোকানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন। পরিশোধ করছেন। কবে কার সাথে একটু কথা কাটাকাটি হয়েছিল, কার সাথে মন কষাকষি হয়েছিল, সবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছেন। ছয় মাস আগে থেকে তিনি বলতেন, আমি মারা গেলে তোমরা আমাকে কোথায় কবর দেবে? দিব্বি সুস্থ একটা মানুষ এসব কথা বললে কেমন লাগে? আমার ভাই বলল, 'কেন আমাদের মহল্লার গোরস্তানে আপনাকে কবর দেব।' কথাটা শুনে যেন আঁৎকে উঠলেন আব্বা। না, না, আমাকে এ গোরস্তানে কবর দিও না। এ গোরস্তানের প্রতিটা কবর শিয়ালে খোঁড়ে। সমাধান আব্বাই দিলেনঃ থাক, এসব নিয়ে চিন্তা কর না। আল্লাহ্ তাআলা যেখানে ভাগ্যে রেখেছেন সেখানেই হবে।

আম্মা হাসলেন, চিন্তা আমরা করছি কই? চিন্তা তো করছেন আপনি। যা হোক, আব্বা নির্দিষ্ট দিনে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। ঈদ হয়ে যায়। কুরবানী হয়ে যায়। তিনি মিনায় অবস্থান করছিলেন। রাত একটার সময় আব্বার হার্ট স্ট্রোক করে। বিকেল বেলা নাকি এক মাওলানা সাহেবকে ধরে বলেছেন, 'হুজুর, আমাকে তাওবা পড়ান তো?'

মাওলানা সাহেব হেসে বলেছেন, কেন আপনি তাওবা জানেন না? লজ্জিত কণ্ঠে আব্বা বলেছেন, জানি, তবুও আপনি মাওলানা মানুষ, তার ওপর আপনি কয়েক বার হজ্জ করেছেন।

ইহরাম বাঁধা অবস্থায় আব্বা চলে গেছেন তাঁর প্রভুর কাছে। মৃত্যুর মুহূর্তে আমার আব্বা আমার মার বুকের সাথে ঠেস দিয়ে বসে ছিলেন। হাত দুটো আকাশপানে তুলে বলেছেন, আল্লাহ্ আমাকে রহম কর। এ ছিল তাঁর শেষ

www.amarboi.org

কথা। আমরা পরদিন সকালেই খবর পেলাম, আব্বা আর এ পৃথিবীতে নেই। তিনি বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। খবর পাওয়ার সাথে সাথেই আমার মনে পড়ল তাঁর বড় চিন্তা ছিল, কোথায় তার কবর হবে?

দেড় মাস পরে আম্মা এলেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। মাগো, তোমার আব্বাকে জান্নাতে রেখে এসেছি। তাঁর বড় চিন্তা ছিল কোথায় কবর হবে। বাংলাদেশের কোনো কবর তাঁর পছন্দ ছিল না। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর জন্য জান্নাতুল মুয়াল্লা ঠিক করে রেখেছিলেন।

আব্বার বিদায় দৃশ্যটা আমি চাক্ষুষ দেখিনি, কিন্তু একাকী চোখ বন্ধ করলেই আমি দেখি আমার আব্বার মৃত্যু। খাওয়ার সুন্নত বসার সুন্নত এমনকি ঘুমের সুন্নতও চেষ্টা করলে হয়তো অভ্যাসে পরিণত করা যায়, কিন্তু সুন্নতী মৃত্যু? প্রিয়তমা স্ত্রীর গায়ে হেলান দিয়ে মৃত্যুবরণ করলেন ঠিক প্রিয় নবীজী (স)- এর ন্যায়। তাঁর শেষ কথা ছিল আল্লাহুম্মাগফির লী- হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা কর!

- আলাহ হাফেজ -

θθθ

আমাদের প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত লেখিকার অন্যান্য বইগুলো পড়ুন:

১. আমরা কেমন মুসলমান

২. স্মৃতির এ্যালবামে তুলে রাখা কয়েকটি দিন

৩. কিছু সত্য বচন

www.amarboi.org

লেখিকার প্রকাশিত কয়েকটি বই

১. যুগে যুগে দাওয়াতী দ্বীনের কাজে মহিলাদের অবদান
২. মহিমান্বিত তিনটি রাত
৩. যিলহজ্ব মাসের তিনটি নিয়ামত
৪ দাউস কক্ষোণো জান্নাতে প্রবেশ করবে না
৫. কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈমান-১
৬. কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈমান-২
৭. স্মৃতির এ্যালবামে তুলে রাখা কয়েকটি দিন
৮. শিরকের শিকড় পৌছে গেছে বহুদূর
৯. নামাজ বেহেশতের চাবী
১০. সুনামী
১১. সাহাবাদের ১৩টি প্রশ্ন আল্লাহ তায়ালার জবাব
১২. ভালবাসা পেতে হলে
১৩. কিছু সত্য বচন
১৪. আমরা কেমন মুসলমান?
১৫. তাকওয়া অর্জনই হোক মুমিন জীবনের লক্ষ্য
১৬. ডুবন্ত পুরুষ
১৭. চরমোনাইয়ের পীর আমাকে জামায়াতে ইসলামীতে নিয়ে এসেছে
১৮. বিভ্রান্তি ছড়াতে তথাকথিত আলেমদের ভূমিকা
১৯. বিদ'য়াতের বেড়াজালে ইসলাম
২০. মহরমের শিক্ষা
২১. সংসার সুখের হয় পুরুষের গুণে
২২. নারী ও পুরুষ পুরস্পরের বন্ধু ও অভিভাবক
২৩. শাফায়াত মিলবে কি?
২৪. স্বস্তির বাতিঘর
২৫. আজ আমার মরতে যে নেই ভয়
২৬. মাসুদা সুলতানা রুমি'র রচনাসমগ্র-১
২৭. মাসুদা সুলতানা রুমি'র রচনাসমগ্র-২

প্রফেসার্স পাবলিকেশন্স
৪৩৫/ক, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার-ঢাকা-১২১৭,
ফোন: ৮৩৫৮৭৩৪, ০১৭১১-১২৮৫৮৬